একক 7 ❐ উদ্ভিদ-রোগ সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

7.2 উদ্ভিদ রোগ ও উদ্ভিদ-রোগবিদ্যা কী ?

7.2.1 উদ্ভিদ রোগ কী ?

7.2.2 উদ্ভিদ-রোগবিদ্যা কী ?

7.3 উদ্ভিদ-রোগ সম্বন্ধে ধারণা

7.4 উদ্ভিদ-রোগ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দাবলী এবং এদের সংজ্ঞা

7.4.1 পোষক উদ্ভিদ বা হোস্ট প্ল্যান্ট **(Host Plant)**

7.4.2 সাসেপ্ট **(Suscept)**

7.4.3 প্যাথোজেন **(Pathogen)** বা নিমিত্ত জীব বা কসাল অরগ্যানিজ্‌ম **(Causal Organism)**

7.4.4 পরজীবী বা প্যারাসাইট **(Parasite)**

7.4.5 প্যাথোজেনেসিটি **(Pathogenecity)**

7.4.6 সংক্রমণ তীব্রতা বা ভিরুলেন্স **(Virulence)**

7.4.7 প্যাথোজেনেসিস্‌ **(Pathogenesis)**

7.4.8 সংক্রমণ বা ইনফেক্‌শন **(Infection)**

7.4.9 ইনোকুলাম **(Inoculum)**

7.4.10 লক্ষণ বা সিম্পটম্‌ **(Symptom)**

7.4.11 প্রতীক বা সাইন **(Sign)**

7.4.12 সিনড্রোম **(Syndrome)**

7.4.13 লীঝ্‌ন্‌ **(Lesion)**

7.4.14 রোগের নিদানতত্ত্ব বা এটিওলজি **(Etiology of disesse)**

7.4.15 রোগ চক্র বা ডিজিজ্ সাইক্ল্ **(Disease cycle)**

7.4.16 রোগ ত্রিভুজ বা ডিজিজ ট্রাইঅ্যাঙ্গল্ **(Disease triangle)**

অনুশীলনী—**I**

7.5 রোগের পরিস্ফুটন

7.5.1 সংক্রমণ বা ইন্ফেক্শ্ন **(Infection)**

7.5.2 সুপ্তকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড **(Incubation period)**

7.5.3 রোগের লক্ষণ বা সিম্পটম্ **(Symptom)** প্রকাশ

7.6 **Koch**-এর স্বতঃসিদ্ধতা

7.7 উদ্ভিদ রোগের সাধারণ লক্ষণ

7.7.1 নেক্রোটিক **(Necrotic)** বা পচনযুক্ত লক্ষণ

7.7.1.1 দাগ বা স্পট **(Spot)**

7.7.1.2 স্পট-হোল **(Spot-hole)**

7.7.1.3 ব্লাইট **(Blight)** বা ধ্বসা

7.7.1.4 রট **(Rot)** বা রোগ

7.7.1.6 ক্যাঙ্কার **(Canker)**

7.7.1.7 ডাই-ব্যাক **(Die bake)**

7.7.2 অ্যাট্রফিক **(Atrophic)**

7.7.2.1 খর্বতা বা ডোয়ার্ফিং **(Dwarfing)**

7.7.2.2 গোলাকার ধারণ বা রোসেটিং **(Rosetting)**

7.7.2.3 ক্লোরোসিস **(Chlorosis)**

7.7.2.4 ভেন্ ক্লিয়ারিং **(Vein clearing)**

7.7.3 হাইপারট্রফিক **(Hypertrophic)**

7.7.3.1 গল **(Gall)**

7.7.3.2 উইচেস্ ব্রুম **(Witches broom)**

7.7.3.3 কার্ল **(Curl)**

7.7.3.4 ক্লাব রুট **(Club root)**

7.8 উদ্ভিদের রোগ দমন

7.8.1 নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা রেগুলেটরি মেথড **(Regulatory method)**

7.8.2 কর্ষণমূলক পদ্ধতি বা কালচার‍্যাল মেসার **(Cultural measure)**

7.8.3 ভৌত পদ্ধতি বা ফিজিক্যাল মেসার **(Physical measure)**

7.8.4 রাসায়নিক পদ্ধতি বা কেমিক্যাল মেসার **(Chemical measure)**

7.8.4.1 অজৈব যৌগ বা ইনঅরগ্যানিক কম্পাউন্ড **(Inorganic compound)**

7.8.4.2 জৈব যৌগ বা অরগ্যানিক কম্পাউন্ড **(Organic compound)**

7.8.4.3 অ্যান্টিবায়োটিক **(Antibiotic)**

7.8.5 জীবীয় দমন **(Biological control)**

7.8.5.1 বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদনকারী আণুবীক্ষণিক জীবের ব্যবহার

7.8.5.2 অধি-পরজীবীতা বা হাইপারপ্যারাসিটিজ্‌ম্ **(Hyperparasitism)**

7.8.5.3 ফাঁদ উদ্ভিদের ব্যবহার

7.8.5.4 বিরোধী উদ্ভিদের ব্যবহার

7.8.5.5 নির্বাচন ও প্রজনন বা সিলেকশ্‌ন অ্যান্ড ব্রিডিং **(Selection & breeding)**

7.8.5.6 পরস্পরবিরোধী সংরক্ষণ বা ক্রস প্রোটেক্‌শ্‌ন্ **(Cross protection)**

7.8.5.7 তন্ত্রীয় অর্জিত প্রতিরোধ বা সিস্টেমিক অ্যাকোয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স **(Systemic acquired resistance)**

অনুশীলনী—II

7.9 সারাংশ

7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

7.11 উত্তরমালা

7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য ঃ

জীবজগতে ব্যাপকতা ও গুরুত্বের বিচারে উদ্ভিদ অনন্য। প্রতিটি জীব খাদ্যের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে এবং এই রাসায়নিক শক্তি শর্করা, প্রোটীন ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। খাদ্যের ব্যাপারে উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল জীব এই সমস্ত খাদ্য উদ্ভিদ হতে সরাসরি সংগ্রহ করে। আবার অনেক জীব যারা উদ্ভিদের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল তারা উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এইভাবে যে খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে উঠেছে, তার ভিত্তিটাই হল উদ্ভিদ। বাঁচার জন্য যেমন আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে উদ্ভিদ, তেমনি উদ্ভিদ থেকে পাই তন্তু, কাঠ, জ্বালানি, ভেষজ-পদার্থ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। সমগ্র জীবজগতের ভিত তথা অস্তিত্বরক্ষাকারী এই উদ্ভিদও অন্যান্য জীবের ন্যায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। আর এই রোগের জন্য যেমন বিভিন্ন জীবাণু দায়ী, তেমনি পরিবেশও দায়ী। যাইহোক, আপনারা এখন নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার অর্থ উদ্ভিদের ফলন হ্রাস তথা জীবের খাদ্যের ঘাটতি, অন্যান্য বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘটা, এককথায় এক গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি হওয়া। তাই উদ্ভিদের রোগ সম্বন্ধে জানা এবং তা দমন করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করা অত্যন্ত জরুরী। আর এই কাজটি করতে গিয়ে বিকশিত হয়েছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা-উদ্ভিদরোগবিদ্যা বা Plant Pathology। এই কারণেই উদ্ভিদ-রোগবিদ্যা সম্পর্কে আপনাদের সম্যক ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন।

উদ্দেশ ঃ এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- উদ্ভিদ-রোগ ও উদ্ভিদ-রোগবিদ্যা কী তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- উদ্ভিদ-রোগ সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা দিতে পারবেন।
- উদ্ভিদ-রোগ বিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ও তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।

- উদ্ভিদ-রোগ পরিস্ফুটন ব্যাখ্যা করতে পারেন।
- উদ্ভিদ-রোগের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- উদ্ভিদ-রোগ দমনের পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

7.2 উদ্ভিদ-রোগ ও উদ্ভিদ-রোগ বিদ্যা কী ?

7.2.1 উদ্ভিদ-রোগ কী ?

উদ্ভিদ দেহে কোনও রকম অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে উদ্ভিদ-রোগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন উদ্ভিদের অতিবৃদ্ধি বা কম বৃদ্ধি, পাতায় দাগ, ছোপ ইত্যাদি। উদ্ভিদরোগের কারণ জীবিয় সংক্রমণ অথবা পরিবেশের প্রভাব অথবা উভয়ই। কাজেই উদ্ভিদরোগ বলতে বুঝায় জীবিয় সংক্রমণ/পরিবেশের প্রভাবে উদ্ভিদ দেহে শারীরবৃত্তীয় কাজে বিঘ্ন ঘটা অথবা গঠনগত অস্বাভাবিক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়া এবং ফলস্বরূপ উদ্ভিদ-দেহাংশের বা সমগ্র-উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া অথবা মৃত্যু ঘটা।

7.2.2 উদ্ভিদ-রোগ বিদ্যা কী ?

উদ্ভিদ-রোগবিদ্যা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের একটি শাখা যাতে উদ্ভিদের রোগ উৎপাদনকারী কারণ সমূহ, রোগ উৎপাদন পদ্ধতি, রোগের লক্ষণ ও রোগ দমন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচিত হয়।

7.3 উদ্ভিদ-রোগ সম্বন্ধে ধারণা ঃ

আপনারা জানেন গাছ কথা বলতে পারে না ; অর্থাৎ তারা মানুষের মত বলতে পারে না তাদের শরীরে কোথায় ব্যথা বা কোথায় তাদের কী অসুবিধা। একটি গাছ যখন তার স্বাভাবিক ছন্দে বেড়ে উঠতে থাকে, তার শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি ঠিকঠাক চলতে থাকে। এই পর্যায়ে আমরা গাছটিকে দেখে বুঝতে পারি গাছটি নিরোগ। গাছ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণ করে এবং জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে তা পাতা ও অন্যান্য অংশে প্রেরণ করে। পাতায় উৎপন্ন খাদ্য গাছের বিভিন্ন সজীব কোষে ফ্লোয়েম কলা দ্বারা প্রেরিত হয়। জল, খনিজ লবণ ও খাদ্যের এই সরবরাহ ঠিকঠাক চলতে থাকলে সজীবকোষগুলি তাদের বিপাক ক্রিয়া যথাযথভাবে চালাতে থাকে ও গাছের সুষম বৃদ্ধি সংঘটিত হয়, ফলে গাছটি য়থা সময়ে তার ফুল ও ফল উৎপাদন করে। উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটাতে পারে, অর্থাৎ এককথায় তার জীনগত ক্ষমতার যথাযথ প্রকাশ ঘটে। কিন্তু মাটিতে যদি জল বা খনিজলবণের ঘাটতি হয় অথবা মূলে

বা পাতায় বা জাইলেম বাহিকায় বা ফ্লোয়েম বাহিকার কোনও অংশে সংক্রমণ ঘটে তাহলে গাছের এই সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে এবং তার লক্ষণ গাছে ফুটে ওঠে।

এই লক্ষণগুলি দেখা গেলে আমরা বুঝতে পারি গাছটি রোগাক্রান্ত হয়েছে। গাছে জীবিয় সংক্রমণ ঘটলে গাছের সংক্রামিত কোষগুলি হতে প্যাথোজেন বা রোগউৎপাদনকারী তার পুষ্টি গ্রহণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিবিষ বা টক্সিন নিঃসরণ করে ফলে কোষগুলি ক্রমশ নিঃস্তেজ হয়ে পড়ে ও মারা যায়। গাছের ঐ অংশে তখন পচনযুক্ত লক্ষণ বা নেক্রোসিস (Necrosis) দেখা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্রমণের ফলে সংক্রামিত অংশের কোষগুলির দ্রুতবিভাজন (হাইপারপ্ল্যাসিয়া, Hyperplasia) অথবা আয়তনের বৃদ্ধি (হাইপারট্রফি, Hypertrophy) ঘটতে থাকে। ফলস্বরূপ ঐ উদ্ভিদ অংশের অতিবৃদ্ধি দেখা যায়, উদাহরণস্বরূপ গল, ব্লিস্টার ইত্যাদি।

জীবীয় সংক্রমণ ছাড়াও পরিবেশের নানা পরিবর্তন যেমন বায়ুদূষণ, মাটিতে পুষ্টির অভাব, অক্সিজেনের ঘাটতি ইত্যাদি কারণেও গাছে রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে গাছের রোগের জন্য বিভিন্ন জীবীয় নিমিত্ত কারক বা বায়োটিক কসাল এজেন্ট (Biotic causal agent) ও অজীবীয় নিমিত্তকারক বা অ্যাবায়োটিক কসাল এজেন্ট (Abiotic causal agent) দায়ী। বায়োটিক কসাল এজেন্টগুলি হল—

(i) ছত্রাক

(ii) শৈবাল

(iii) ব্যাকটেরিয়া ও মলিকিউটস (Mollicutes)

(iv) পরজীবী উদ্ভিদ (উদাহরণ—স্বর্ণলতা)

(v) ভাইরাস ও ভাইরয়েড

(vi) নিমাটোড

(vii) প্রোটোজোয়া

মলিকিউটস (Mollicutos) : এগুলি কোষপ্রাচীরবিহীন মাইকোপ্লাজমা জাতীয় প্রোক্যারিওটিক (Prokaryotic) বা আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত গঠন, যা উদ্ভিদের ফ্লোয়েম কলায় সংক্রমণ ঘটায় এবং উদ্ভিদে হলুদ অথবা লাল বর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মলিকিউটস, টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline) নামক অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল। উদাহরণ—স্পাইরোপ্লাজমা (Spiroplasma).

অ্যাবায়োটিক কসাল এজেন্টগুলি হল—

(i) তাপমাত্রা (খুব বেশি বা খুব কম),

(ii) মাটির আদ্রতা (খুব বেশি বা খুব কম),

(iii) আালো (খুব বেশি বা খুব কম),

(iv) অক্সিজেনের ঘাটতি,

(v) বায়ুদূষণ,

(vi) পুষ্টির অভাব,

(vii) মাটির অম্লতা অথবা ক্ষারত্বের পরিবর্তন

(viii) মাটিতে বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি ইত্যাদি।

ভাইরয়েড (Viroid) : এটি একপ্রকার ক্ষুদ্র, নগ্ন, একতন্ত্রী, গোলাকার ও উদ্ভিদ সংক্রমণকারী RNA. উদাহরণ—পোটাটো স্পিন্ডিল টিউবার ভাইরয়েড (Potato spindle tuber viroid, PSTV)

7.4 উদ্ভিদ-রোগ সম্পর্কিত কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দাবলী এবং এদের সংজ্ঞা ঃ

7.4.1 পোষক উদ্ভিদ বা হোস্ট প্ল্যান্ট (Host Plant) :

কোন উদ্ভিদ পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হলে তাকে পোষক উদ্ভিদ বলে। সাধারণত রোগউৎপাদনকারী পরজীবী বা প্যাথোজেন তার জীবনচক্র একটিমাত্র পোষকেই সম্পন্ন করে। কিন্তু এমন প্যাথোজেনও রয়েছে যাদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি পোষকের প্রয়োজন হয়। এই দুটি পোষকের মধ্যে একটি হল প্রধান পোষক বা প্রিন্সিপাল হোস্ট (Principal host) এবং অপরটি হল একান্তর পোষক বা অলটারনেট হোস্ট (Alternate host) যেমন গমের কৃষ্ণমরিচা রোগ (ব্ল্যাক রাস্ট অভ হুইট, Black rust of wheat) উৎপাদনকারী ছত্রাক পাক্সিনিয়া গ্র্যামিনিস ট্রিটিসির **(Puccinia graminis treitici)** জীবনচক্র সম্পন্ন করতে গম ও বারবেরী এই দুই পোষকের প্রয়োজন এবং এই দুই পোষকের মধ্যে গম হল প্রধান পোষক এবং বারবেরী হল একান্তর পোষক।

আবার এমন প্যাথোজেনও রয়েছে বা একাধিক ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদে সংক্রমণ ঘটাতে পারে এবং প্রত্যেক পোষকেই সে তার জীবনচক্র সম্পন্ন করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি পোষক হল প্রধান পোষক এবং অপর পোষক বা পোষকগুলি হল সহায়ক বা সমান্তরাল বা কোল্যাটারাল হোস্ট (Collateral host)

উদাহরণ—ধানের বাদামী দাগ রোগ বা ব্রাউন স্পট্ অফ্ রাইস (Brown spot of rice) উৎপাদনকারী ছত্রাক হেলমিন্থোস্পোরিয়াম ওরাইজি (Helminthosporium oryzae) প্রধান (প্রধান পোষক) ছাড়াও লিরসিয়া হেক্সান্ড্রা (Leersia hexandra) ও এক্যাইনোক্লোয়া কোলোনা (Echinochloa colona) নামক দুটি সমান্তরাল পোষকে সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

7.4.2 সাসেপ্ট (Suscept) :

কোন উদ্ভিদ কোন প্যাথোজেন দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হলে উদ্ভিদটিকে সাসেপ্ট বলে।

7.4.3 প্যাথোজেন (Pathogen) বা নিমিত্ত জীব বা কসাল অরগ্যানিজম্ (Causal organism) :

রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী জীবকে প্যাথোজেন বা কসাল অরগ্যানিজম্ বলে। উদাহরণ—নিমাটোড, ছত্রাক, ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি।

7.4.4 পরজীবী বা প্যারাসাইট (Parasite) :

যে সমস্ত জীব খাদ্যের বা পুষ্টির ব্যাপারে আশ্রয় জীবদেহের (পোষকের) উপর নির্ভরশীল তাদেরকে পরজীবী বলে। যেমন একটি প্যাথোজেন হল পরজীবী। তবে একটা কথা আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সব প্যাথোজেন পরজীবী হলেও সব পরজীবী প্যাথোজেন নয়, কারণ রাইজোবিয়াম নামক নাইট্রোজেন স্থিতিকারী ব্যাকটেরিয়া শিম্বজাতীয় উদ্ভিদে পরজীবী হিসাবে বসবাস করে, কিন্তু ঐ ব্যাকটেরিয়া ও পোষকের মধ্যে পুষ্টির আদান প্রদান ঘটায় পরজীবিয় সম্পর্কটি মিথোজীবিয় পর্যায়ে উন্নীত হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে উক্ত ব্যাকটেরিয়া উপকারী পরজীবী হিসাবে পোষক দেহে বিরাজ করে।

7.4.5 প্যাথোজেনেসিটি (Pathogenecity) :

একটি প্যাথোজেনের রোগ উৎপাদনের ক্ষমতাকে প্যাথোজেনেসিটি বলা হয়।

7.4.6 সংক্রমণ তীব্রতা বা ভিরুলেন্স (Virulence) :

কোন একটি প্যাথোজেনের প্যাথোজেনেসিটির মাত্রাকে সংক্রমণ তীব্রতা বলা হয়।

7.4.7 প্যাথোজেনেসিস্ (Pathogenesis) :

একটি প্যাথোজেনের রোগ উৎপাদন পদ্ধতিকে প্যাথোজেনেসিস বলা হয়, অর্থাৎ রোগ উৎপাদনের জন্য একটি প্যাথোজেন যে ধারাবাহিক পদ্ধতি অবলম্বন করে, তাকে প্যাথোজেনেসিস বলে।

7.4.8 সংক্রমণ বা ইনফেক্শন (Infection) :

একটি পরজীবী কর্তৃক পোষক উদ্ভিদের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠাকে সংক্রমণ বলে।

7.4.9 ইনোকুলাম (Inoculum) :

কোন প্যাথোজেন বা তার অংশ (যেমন কোন অঙ্গ বা রেণু) যা সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম, তাকে ইনোকুলাম বলে।

শীত বা গ্রীষ্ম অতিবাহিত করে প্যাথোজেন বা তার অংশ যখন কোন উদ্ভিদে সংক্রমণ ঘটায় তখন তাকে প্রাথমিক ইনোকুলাম বা প্রাইমারী ইনোকুলাম বলে। একটি সংক্রামিত উদ্ভিদ হতে প্যাথোজেন বা তার অংশ যখন অন্য উদ্ভিদে সংক্রমণ ঘটায় তখন তাকে গৌণ ইনোকুলাম বলে ; অর্থাৎ ঋতুনির্ভর কোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঋতুর প্রথম সংক্রমণটি যে ইনোকুলাম দ্বারা সংঘটিত হয় তাকে প্রাথমিক ইনোকুলাম বলে এবং প্রাথমিক ইনোকুলামা দ্বারা সংক্রামিত উদ্ভিদ হতে যে ইনোকুলাম দ্বারা রোগের বিস্তার বা স্প্রেড (Spread) অনুষ্ঠিত হয় তাকে গৌণ ইনোকুলাম বলে।

7.4.10 লক্ষণ বা সিম্পটম্ (Symptom) :

কোন একটি সংক্রমণের ফলে উদ্ভূত রোগ উদ্ভিদদেহে যে সমস্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদেরকে ঐ রোগের লক্ষণ বলে। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য সংক্রমণ ব্যাতীত অজীবিয় কারণেও উদ্ভিদ-রোগ হতে পারে, তাই লক্ষণের সামগ্রিক সংজ্ঞাটি হল ঃ জীবীয় বা আজীবীয় কারণে উদ্ভিদ-দেহে রোগের প্রকাশ যে সমস্ত পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতার মাধ্যমে ঘটে তাদেরকে রোগের লক্ষণ বলে।

7.4.11 প্রতীক বা সাইন (Sign) :

পোষক উদ্ভিদদেহের উপর কোন প্যাথোজেনের বা তার অংশের উপস্থিতি উহার প্রতিক্রিয়ালব্ধ ফলাফল (যেমন উদ্ভিদদেহ হতে কোন প্রকার নিঃসরণ) রোগের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। বস্তুত সাইন রোগ উৎপাদনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় এবং এটি পরীক্ষাগারে নির্ণীত হয়।

7.4.12 সিনড্রোম (Syndrome) :

একটি রোগ একাধিক লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হতেদ পারে এবং এই লক্ষণগুলিকে একযোগে সিনড্রোম বলা হয় ; যেমন কোন একটি রোগে মূলের পচন, উদ্ভিদের নেতিয়ে পড়া, উদ্ভিদের বৃদ্ধি-হ্রাস ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন এই লক্ষণগুলিকে একযোগে সিনড্রোম বলে।

7.4.13 লীঝ্ন্ (Lesion) :

উদ্ভিদ রোগ যখন কোন উদ্ভিদ অঙ্গো গঠনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তখন ঐ পরিবর্তনকে লীঝ্ন্ বলে এবং যে অংশ জুড়ে লীঝ্ন্ প্রকাশ পায় তাকে লীঝ্ন্যাল এরিয়া (Lesional area) বলে।

7.4.14 রোগের নিদানতত্ত্ব বা এটিওলজি (Etiology of diseasse) :

রোগের কারণসমূহ নির্ণয় অধ্যয়নকে রোগের এটিওলজি বলে।

7.4.15 রোগ চক্র বা ডিজিজ্ সাইক্ল্ (Disease cycle) :

উদ্ভিদরোগের ক্ষেত্রে কতকগুলি ধারাবাহিক ঘটনা পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে যে চক্র প্রদর্শন করে তাকে রোগ চক্র বলে। এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলি হল-জীবায়ণ বা ইনোকুলেশন (Inoculation), অনুপ্রবেশ বা পেনিট্রেশন (Penetration), সংক্রমণ বা ইনফেক্শন (Infection), ইনভেসন্ (Invesion), প্যাথোজেনের জনন, প্যাথোজেনের বিস্তার, শীত বা গ্রীষ্ম ঋতু অতিবাহিতকরণ (ওভার উইন্টারিং বা ওভারসামারিং, Overwintering or oversummering)।

প্রাথমিক ইনোকুলাম দ্বারা রোগচক্র শুরু হলে সেই চক্রকে প্রাথমিক রোগচক্র বা প্রাইমারি ডিজিজ সাইকল (Primary disease cycle) এবং গৌণ ইনোকুলাম দ্বারা রোগ চক্র শুরু হলে সেই রোগ চক্রকে গৌণ রোগচক্র বা সেকেন্ডারি ডিজিজ সাইক্ল্ (Secondary disease cycle) বলে।

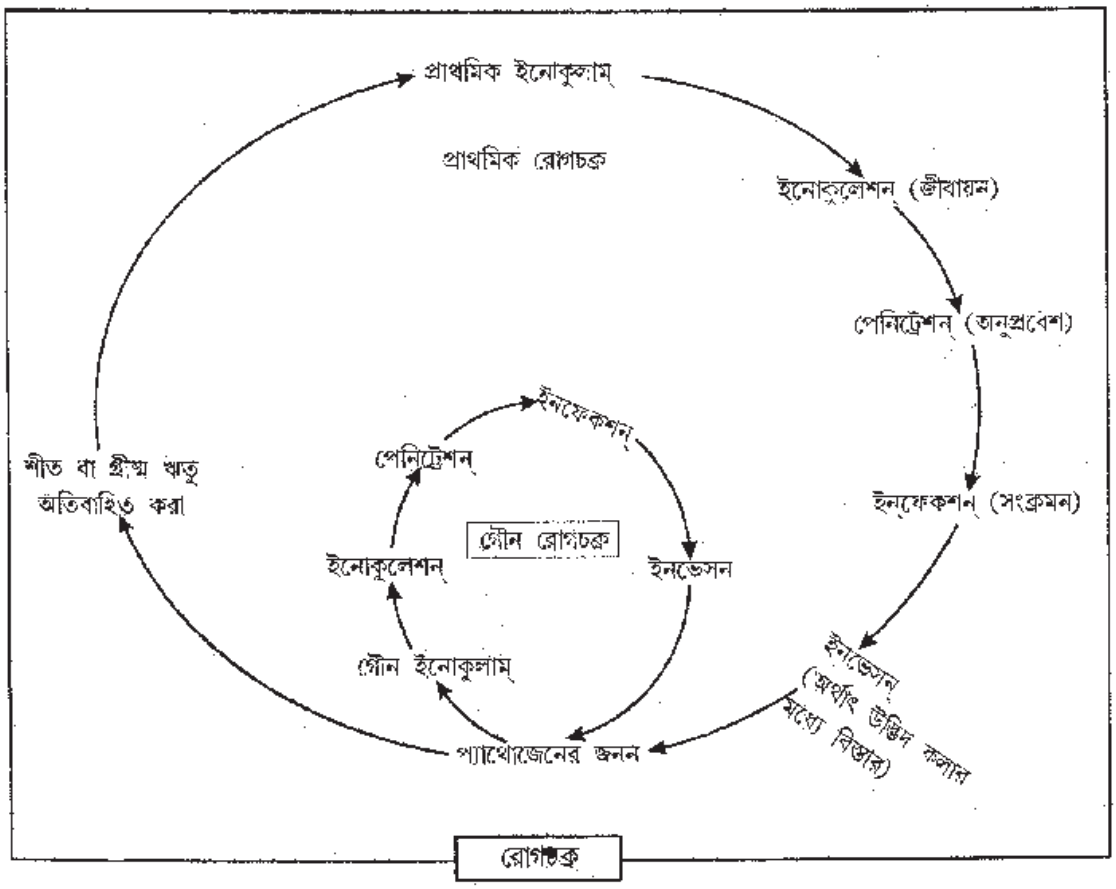

7.4.16 রোগ ত্রিভুজ বা ডিজিজ ট্রাইঅ্যাঙ্গাল্ (Disease triangle) :

উদ্ভিদ রোগের তিনটি উপাদান হল পোষক, প্যাথোজেন ও পরিবেশ এবং এই তিন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়া বা ইন্টারঅ্যাক্শ্ন (Interaction) একটি ত্রিভুজের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। এই ত্রিভুজকেই রোগ ত্রিভুজ বা ডিজিজ ট্রাইঅ্যাঙ্গাল বলে। ত্রিভুজ অন্তর্বর্তী স্থানটি রোগের পরিমাণকে নির্দেশ করে।

অনুশীলনী—I

1. নীচে প্রদত্ত তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ/শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) উদ্ভিদ রোগ ঘটায় _____ _____ _____ ও _____ _____।

(b) মলিকিউটস হল কোষপ্রাচীর বিহীন _____ গঠন এবং _____ অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল। - এক প্রকার মলিকিউট এবং এটি উদ্ভিদের _____ কলায় সংক্রমণ ঘটায়।

(c) ভাইরয়েড এক প্রকার ক্ষুদ্র _____ _____ গোলাকার ও উদ্ভিদ সংক্রমণকারী।

(d) হেলমিন্থোস্পোরিয়াম ওরাইজীর ধান বা ওরাইজ্যা স্যাটিভা হল _____ পোষক এবং একাইনোক্লোয়া কোলোনা হল _____ পোষক।

(e) কোন উদ্ভিদ প্যাথোজেন দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হলে উদ্ভিদটিকে _____ বলে। সব _____ পরজীবী কিন্তু সব _____ _____ নয়।

(f) উদ্ভিদ অঙ্গের যে অংশ জুড়ে উদ্ভিদ রোগ প্রকাশ পায় সেই অংশটিকে _____ _____ বলে। রোগের কারণসমূহ নির্ণয় ও অধ্যয়নকে রোগের _____ বলে।

(g) _____ _____ ও _____ এর মধ্যে পারস্পরিক _____ একটি _____ এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় এবং এই _____ কে ডিজিজ ট্রাইঅ্যাঙ্গাল বলে।

(লীঝন্যাল এরিয়া, পোষক, ত্রিভুজ, এটিওলজি, মিথোস্ক্রিয়াকে, সাসেপ্ট, ত্রিভুজ, প্যাথোজেন, প্রধান প্যাথোজেন, সমান্তরাল, পরিবেশ, পরজীবী, একতন্ত্রী, প্যাথোজেন, নগ্ন, প্রোক্যারিওটিক, বায়োটিক কসাল এজেন্ট, RNA, টেট্রাসাইক্লিন, অ্যাবায়োটিক কসাল এজেন্ট, ফ্লোয়েম, স্পাইরোপ্লাজমা)

7.5 রোগের পরিস্ফুটন বা ডিজিজ ডেভেলপ্‌মেন্ট (Disease development)

রোগের পরিস্ফুটন মূলত তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঘটে এবং এগুলি হল সংক্রমণ বা ইন্‌ফেক্‌শন্‌ (Infection), সুপ্তকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Infection period) এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশ।

7.5.1 সংক্রমণ বা ইন্‌ফেক্‌শ্‌ন (Infection) :

ইন্‌ফেক্‌শনের জন্য প্রয়োজন ইনোকুলেশ্‌ন্‌ (Inoculation) অর্থাৎ প্যাথোজেন বা তার অংশবিশেষের সাথে পোষকের সংস্পর্শ ঘটা এবং পেনিট্রেশন অর্থাৎ প্যাথোজেন কর্তৃক উদ্ভিদের কলায় প্রবেশ।

ইনোকুলেশন ঘটনাটি ঘটে যখন কোন ইনোকুলাম, যেমন কোন ছত্রাকের রেণু, উদ্ভিদ দেহের সংস্পর্শে আাসে। এরপর রেণুটি অঙ্কুরিত হয়ে একটি অঙ্কুর নালিকা গঠন করে। অঙ্কুর নালিকার অগ্রভাগ পোষকের তল স্পর্শ করলে তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্ফীত ও চ্যাপ্টা হয়ে অ্যাপ্রেসোরিয়াম (Appressorium) নামক গঠন সৃষ্টি করে। অ্যাপ্রেসোরিয়াম প্যাথোজেন ও পোষকের মধ্যে স্পর্শক্ষেত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সংযোগ দৃঢ় করে। অনেক সময় মিউসিলেজ নিঃসৃত হয়ে এই সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করে। অ্যাপ্রেসোরিয়াম হতে এরপর একটি গোঁজ সদৃশ হাইফা বা হাইফাল পেগ (Hyphal peg) বা ইনফেকশন্‌ হাইফা (Infection hypha) উৎপন্ন হয়ে পোষক কোষের কিউটিকল্‌ ও কোষ প্রাচীর ভেদ করে কোষের অভন্তেরে প্রবেশ করে। ছত্রাক জাতীয় প্যাথোজেন পোষকের কিউটিক্‌ল স্তর ভেদ করার সময় যান্ত্রিক বল প্রয়োগ করে এবং কোষ প্রাচীর ভেদ করার সময় শুধুমাত্র যান্ত্রিক বল অথবা যান্ত্রিক বলের সাথে প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত উৎসেচক অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে উৎসেচক কোষ প্রাচীরকে নরম করে তোলে ফলে যান্ত্রিক বল প্রয়োগেই হাইফা অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারে।

উপরোক্ত বর্ণিত পদ্ধতিটি হল সরাসরি অনুপ্রবেশ বা ডাইরেক্ট পেনিট্রেশ্‌ন্‌ (Direct penetration) পদ্ধতি। সরাসরি অনুপ্রবেশ ছত্রাক, নিমাটোড ও পরজীবী উদ্ভিদ করতে পারে। সরাসরি অনুপ্রবেশ ছাড়াও পত্ররন্ধ্র, লেন্টিসেল, ক্ষত ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং তা ব্যাকটিরিয়া, মলিকিউটস, ভাইরাস, ভাইরয়েড ইত্যাদির ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য, তবে ছত্রাক ও নিমাটোড এরূপ উন্মুক্ত পথ পেলে অবশ্যই তার সুযোগ নিতে ছাড়ে না।

কোষে প্রবেশ করার পর হয় হাইফাল পেগ (Hyphel peg) থেকে সূক্ষ্ম হাইফা উৎপন্ন হয় (চিত্র 7.1) অথবা হাইফাল পেগেল (Hyphal peg) অগ্রভাগ স্ফীত হয়ে ভেসিক্‌ল্‌ গঠন করে (চিত্র 7.2) এরপর ঐ ভেসিক্‌ল্‌ থেকে সূক্ষ্ম হাইফা উৎপন্ন হয়। পোষক কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে প্যাথোজেন পোষক কোষ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে ও পোষক কোষের প্রতিরোধ প্রতিহত করে পোষক কোষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, অর্থাৎ সংক্রমণ বা ইনফেকশ্‌ন্‌ সংগঠিত হয়। কাজেই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে পোষকের সাথে

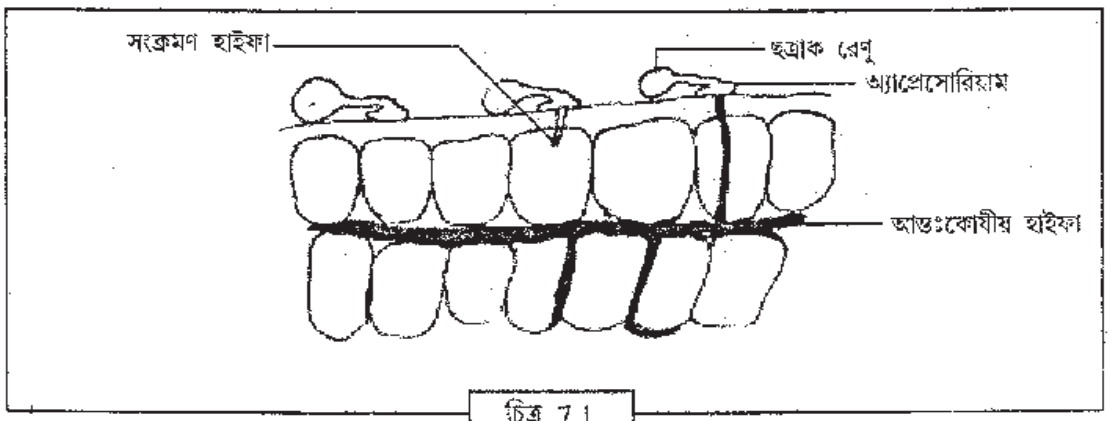

চিত্র 7.1

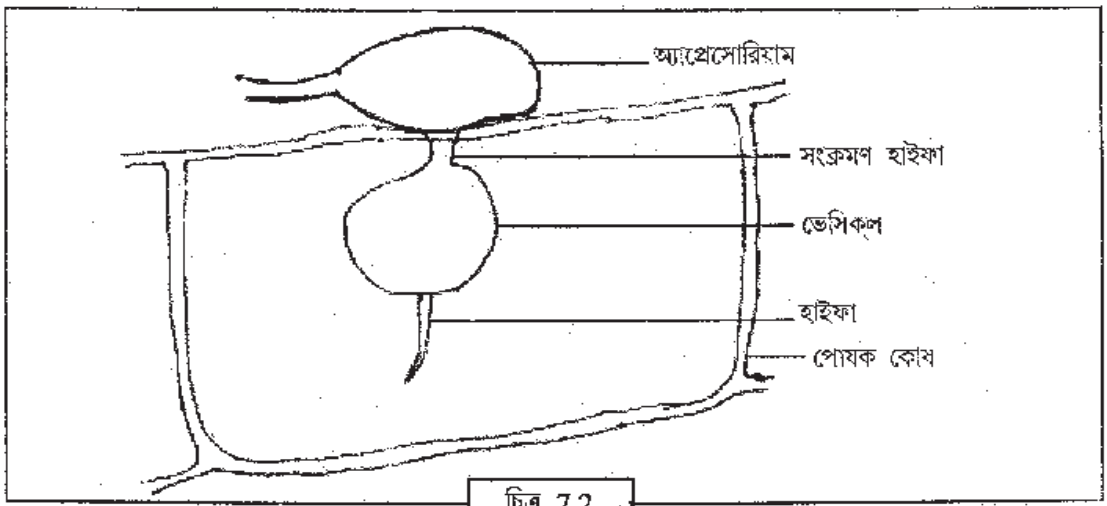

চিত্র 7.2

প্যাথোজেনের সংস্পর্শ বা প্যাথোজেন কর্তৃক পোষকে অনুপ্রবেশ ঘটা মানে এই নয় যে ইনফেক্‌শ্‌ন্‌ সংঘটিত হল।

প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য অনুপ্রবেশ ঘটার পর বাধ্যতামূলক পরজীবী বা ওবলিগেট প্যারাসাইট (Obligate parasite) ও স্বেচ্ছামূলক মৃতজীবী বা ফ্যাকালটেটিভ স্যাপ্রোফাইটের (Facultative saprophyte) আচরণ স্বেচ্ছামূলক পরজীবী বা ফ্যাকালটেটিভ প্যারাসাইটের (Facultative parasite) আচরণ হতে ভিন্ন হয়। বাধ্যতামূলক পরজীবী ও স্বেচ্ছামূলক মৃতজীবী হস্টোরিয়া নামক শোষণ অঙ্গোর মাধ্যমে পোষক হতে পুষ্টি সংগ্রহ করতে থাকে কিন্তু স্বেচ্ছামূলক পরজীবী আক্রান্ত পোষক কোষ ও সংলগ্ন পোষক কোষগুলিকে মেরে ফেলে এবং মরে যাওয়া কোষ হতে পুষ্টি সংগ্রহ করে।

7.5.2 সুপ্তকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation period) ঃ

প্যাথোজেন কর্তৃক ইনফেক্শ্ন্ সংঘটিত হওয়ার পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়কে সুপ্ত কাল বা ইন্কিউবেশন্ পিরিয়ড বলা হয়। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য কোন কোন উদ্ভিদ-রোগবিদ্যাবিদের বা প্ল্যান্ট প্যাথোলজিস্টের মতে ইনোকুলেশনের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়টি হল সুপ্তকাল।

প্রকৃতপক্ষে এই সুপ্তকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ডের সময় প্যাথোজেন কোষান্তর স্থানে অথবা একটি কোষ হতে অপর কোষে বর্ধিত হতে থাকে এবং উৎসেচকও অনেকক্ষেত্রে অধিবিষ বা টক্সিন নিঃসরণ করতে থাকে। ফলস্বরূপ কোষগুচ্ছের মৃত্যু ও একসময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

7.5.3 রোগের লক্ষণ বা সিম্পটম্ (Symptom) প্রবেশ ঃ

প্যাথোজেন কর্তৃক পোষক কোষের মৃত্যু অথবা অতিবৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে উদ্ভিদ অঙ্গো যথোপযুক্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের লক্ষণের মাত্রা প্রকাশ হওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্যাথোজেনের সংক্রমণ তীব্রতা বা ভীরুলেন্সই দায়ী নয়। অনুকূল পরিবেশের প্রভাবও অনেকখানি দায়ী।

প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য রোগের লক্ষণ যদি শুধুমাত্র সংক্রমণ স্থানকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সেই রোগকে জটিল স্থানিক রোগ বা লোকালাইজড্ ডিজিজ (Localized disease) বলে, যেমন পাতায় দাগ বা লিফস্পট (Leaf spot), আবার রোগের লক্ষণ যদি সংক্রমণ স্থানে এবং সংক্রমণ স্থান হতে দূরেও প্রকাশ পায় তাহলে সেই রোগকে তন্ত্রীয় রোগ বা সিস্টেমিক ডিজিজ (Systemic disease) বলে যেমন ভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট রোগ বা ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট লুজ্ স্মাট্ রোগ (Loose smut disease) ইত্যাদি।

7.6 Koch-এর স্বতঃসিদ্ধতা (Koch's postulates) :

কোন উদ্ভিদে রোগ দেখা দিলে সেই রোগ এবং প্যাথোজেন যদি পূর্বপরিচিত হয় তাহলে সহজেই ঐ রোগ ও প্যাথোজেনকে শনাক্ত করা যায়। কিন্তু রোগটি যদি অজানা হয় এবং নথিভুক্ত না থাকে তাহলে ঐ রোগ ও রোগের জন্য দায়ী প্যাথোজেনকে শনাক্ত করতে Koch প্রবর্তিত সতঃসিদ্ধতা বা মৌলিক নীতি অনুসরণ করতে হয়। রোগ ও প্যাথোজেনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য জার্মান চিকিৎসাবিদ (Robert Koch, 1843-1910) যে শর্তগুলি আরোপ করেন তা Koch মৌলিক নীতি বা স্বতঃসিদ্ধতা হিসাবে পরিচিত। বস্তুত Koch অ্যানথ্রাক্স রোগ ও তার জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া, ব্যাসিলাস্ অ্যানথ্রাসিসের **(Bacillus anthracis)** মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে এই নীতিগুলি নির্ধারণ করেন (1876)।

Koch প্রবর্তিত নীতিগুলির নিম্নরূপ ঃ

1. সমস্ত পরীক্ষিত রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের সাথে প্যাথোজেনটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে,

2. রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ হতে প্যাথোজেনটিকে অবশ্যই পৃথক করে পুষ্টি-মাধ্যমে (neutientmedium) বর্ধিত করে বিশুদ্ধীকরণ বা পিওর কালচার (Pure culture) প্রস্তুত করতে হবে এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি নথিভুক্ত করতে হবে।

3. পিওর কালচার হতে প্যাথোজেনটিকে নিয়ে একই প্রজাতির সুস্থ উদ্ভিদ দেহে অবশ্যই ইনোকুলেট করতে বা সংস্পর্শ ঘটাতে হবে এবং ঐ উদ্ভিদে উৎপন্ন রোগ অবশ্যই অনুরূপ হতে হবে।

4. ইনোকুলেট করা রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ হতে প্যাথোজেনটিকে অবশ্যই পৃথক করে বিশুদ্ধ কর্ষণ করতে হবে এবং উক্ত প্যাথোজেনের বৈশিষ্ট ২নং এ নথিভুক্ত বৈশিষ্ট্যের সাথে অবশ্যই অনুরূপ হতে হবে।

উল্লিখিত কখের নীতিগুলি যথাযথ অনুসৃত হলে যদি প্রমাণ হয় সবই সঠিক ভাবে প্রযোজ্য তবেই বলা যাবে একটি নির্দিষ্ট প্যাথোজেন একটি নির্দিষ্ট রোগের সাথে সম্পর্কিত। Koch-এর উক্ত নীতিগুলি ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, উচ্চতর পরজীবী উদ্ভিদ, নিমাটোড, কতিপয় ভাইরাস ও ভাইরয়েড এবং স্পাইরোপ্লাজমার (Spiroplasma) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও কিছু ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা, ফ্লোয়েম সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া রয়েছে যাদের পুষ্টি মাধ্যমে কর্ষণ করা যায় না অথবা যাদের অপর উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে

রোগ উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না, তাদের ক্ষেত্রে কখ্ এর নীতিগুলি প্রযোজ্য নয়। তবে প্যাথোজেন পৃথক করার, কর্ষণ করার ও ইনোকুলেট করার উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে, যাদের ক্ষেত্রে Koch-এর নীতিগুলি প্রযোজ্য এখন নয় তাদের ক্ষেত্রেও কখের নীতি প্রয়োগ করা সম্ভবপর হবে।

7.7 উদ্ভিদ-রোগের সাধারণ লক্ষণ

আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে জীবীয় বা অজীবীয় কারণে উদ্ভিদ-দেহে রোগের প্রকাশ যে সমস্ত পরিবর্তন বা অস্বাভাবিকতার মাধ্যমে ঘটে তাদেরকে রোগের লক্ষণ বলে। এখন আসুন আমরা উদ্ভিদ-রোগের বিভিন্ন লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করি।

উদ্ভিদ-রোগের লক্ষণগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় এবং এগুলি হল—(i) নেক্রোটিক (Necrotic) বা পচনযুক্ত লক্ষণ, (ii) অ্যাট্রফিক (Atrophic) অথবা হাইপোপ্ল্যাসটিক (Hypoplastic) লক্ষণ ও (iii) হাইপারট্রফিক (Hypertrophic) অথবা হাইপারপ্ল্যাস্টিক (Hyperplastic) লক্ষণ।

7.7.1 নেক্রোটিক (Necrotic) বা পচনযুক্ত লক্ষণ ঃ

এক্ষেত্রে রোগের উদ্ভিদ-অঙ্ক বা কলার ধ্বংস তথা মৃত্যু সংঘটিত হয়। এই জন্য এই প্রকার রোগকে পচন-রোগ বা নেক্রোসিস (Necrosis) বলে। নেক্রোটিক লক্ষণ নিম্নলিখিত নানা প্রকারের হতে পারে,—

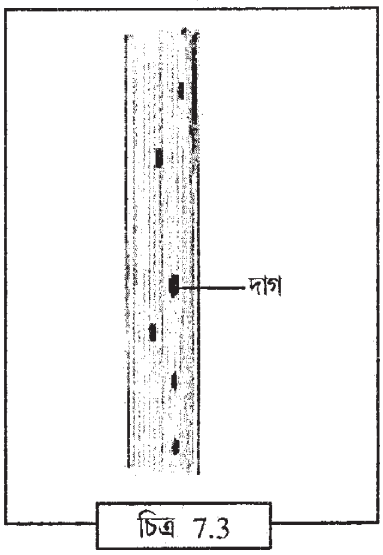

চিত্র 7.3

7.7.1.1 দাগ বা স্পট (Spot) (চিত্র 7.3) ঃ

এক্ষেত্রে উদ্ভিদদেহের রোগাক্রান্ত অঞ্চলের কলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও ঐ অঞ্চলে বাদামী বা কালচে বাদামী দাগ সৃষ্টি হয়। উক্ত দাগ সাধারণত গোলাকৃতি হয়, তবে কোনাকার বা অ্যাঙ্গুলারও (Angular) হতে পারে। দাগ-লক্ষণটি সাধারণত পাতায় দেখা যায়। তবে কাণ্ড, ফল ও ফুলের পাপড়িতেও এই লক্ষণ দেখা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কালচে বাদামী দাগকে ঘিরে হলুদাভ অথবা লোহিতাভ অঞ্চল দেখা যায়। উদাহরণ—ধানের বাদামী দাগ

রোগ বা ব্রাউন স্পট অভ্ রাইস্ (Brown spot of rice) যা হেলমিন্থোস্পোরিয়াম্ ওরাইজী (*Helmintho sporium oryzae*) নামক ছত্রাক দ্বারা সংঘটিত হয়।

7.7.1.2 শট-হোল (Shot-hole) (চিত্র 7.4) ঃ

অনেক সময় দাগ রোগ যুক্ত পাতার রোগক্রান্ত পচে যাওয়া অংশটি খসে পড়ে ও গর্তের সৃষ্টি করে। একেই শট-হোল রোগ বলে। এই রোগ পেয়ারা, পুঁই ইত্যাদি পাতায় দেখা যায়।

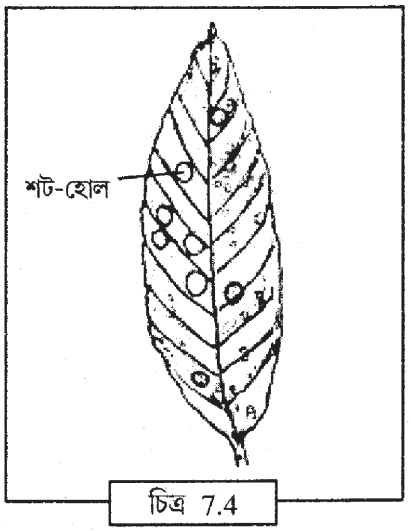

চিত্র 7.4

7.7.1.3 ব্লাইট (Blight) বা ধ্বসা (চিত্র 7.5) ঃ

এটি প্রভুত ক্ষতিকারক একপ্রকার উদ্ভিদ রোগ। এই রোগে পাতা কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আক্রান্ত অঞ্চল বাদামী বা কালো বর্ণ ধারণ করে, অনেকক্ষেত্রে আঠালো পদার্থে পরিণত হয় ও দুর্গন্ধ নির্গত করে। দাগ রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অঞ্চলটি যেমন সীমাবদ্ধ থাকে, এক্ষেত্রে সেই সীমাবদ্ধতা থাকে না এবং কলা বা অঙ্গের পচন দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। উদাহরণ—ধানের ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ব্লাইট রোগ যা জ্যান্থোমোনাস ওরাইজী (Xanthomonas orzae) কর্তৃক সংঘটিত হয়, আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ বা লেট ব্লাইট অভ্ পটেটো (Late blight of potato) যা ফাইটোফ্থোরা ইন্ফেস্ট্যান্স (Phytophthora infestans) কর্তৃক সংঘটিত হয়।

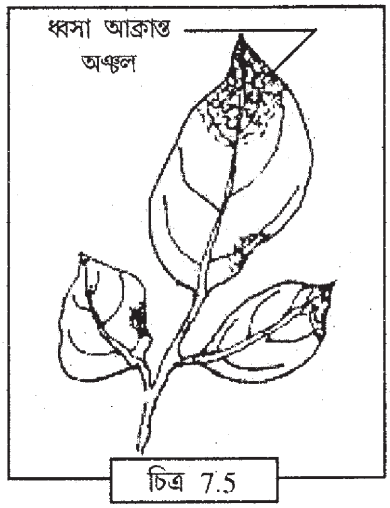

চিত্র 7.5

7.7.1.4 রট (Rot) বা পচন রোগ ঃ

এই রোগে আক্রান্ত উদ্ভিদ কলা নরম হয়ে যায়। বর্ণের পরিবর্তন বা বর্ণহীন হয়ে যায় এবং আক্রান্ত অঙ্গ যদি রসালো হয় তাহলে তা বিনষ্ট হয়। উদাহরণ—রাইজোপাস (Rhizopus) কর্তৃক মিষ্টি আলুর নরম পচন বা

সফ্‌ট্‌ রট্‌ (Soft rot) (চিত্র 7.6) ফেলিনাস (Phellinus) নামক ছত্রাক কর্তৃক উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশের শ্বেতপচন বা হোয়াইট রট্‌ (White rot)। ফোমিটপ্‌সিস্‌ (Fomitopsis) নামক ছত্রাক কর্তৃক উদ্ভিদের কাষ্ঠল অংশের বাদামী পচন বা ব্রাউন রট (Brown rot)।

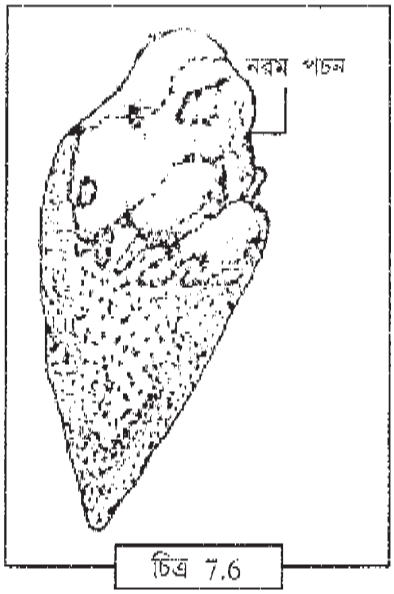

চিত্র 7.6

7.7.1.5 ড্যাম্পিং আফ (Damping off) বা হাজা রোগ (চিত্র 7.7) ঃ

এটিও একপ্রকার পচন রোগ তবে এটি সাধারণত চারাগাছে দেখা যায়। এক্ষেত্রে চারাগাছের কাণ্ডের যে আংশ মাটির উপরিতল সংলগ্ন তাকে সেই অংশে সংক্রমণ ঘটে ও ঐ অংশ পচে যাওয়ার ফলে চারাগাছটি নেতিয়ে পড়ে। উদাহরণ—পিথিয়াম (Pythium) নামক ছত্রাক কর্তৃক কুমড়ো, বিন ইত্যাদির চারাগাছে এই রোগ দেখা যায়।

7.7.1.6 ক্যাঙ্কার (Canker) (চিত্র 7.8) ঃ

এটি একপ্রকার অবতল পচন যুক্ত ক্ষত, সুস্পষ্ট কিনারা যুক্ত এবং বৃক্ষের কাণ্ড বা শাখায় দেখা যায়। উদাহরণ—নেক্‌ট্রিয়া **(Nectria)** নামক ছত্রাক কর্তৃক আপেল উদ্ভিদে ক্যাঙ্কার, জ্যান্থোমোনাস সাইট্রি **(Xanthomonas citri)** নামক ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট লেবু গাছের ক্যাঙ্কার।

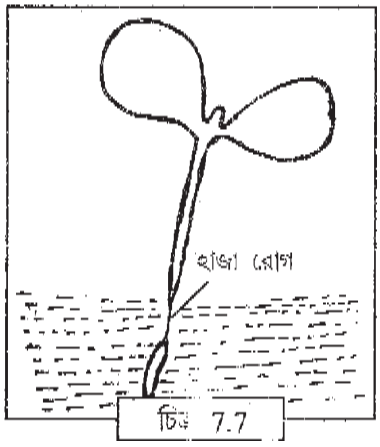

চিত্র 7.7

7.7.1.7 ডাই-ব্যাক (Die bakc) ঃ

এক্ষেত্রে উদ্ভিদের বিটপ অংশের অগ্রভাগ হতে পচন শুরু হয়ে ক্রমশ গোড়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং সমগ্র উদ্ভিদটি মারা যায়। এই রোগ লেবু গাছে সাধারণত দেখা যায়।

উপরিউক্ত রোগগুলি ছাড়াও আরও নানাপ্রকার নেক্রোসিস লক্ষণ দেখা যায়, যেমন ব্লচ্ (Blotch), নেতিয়ে পড়া বা উইল্ট (Wilt), মরিচা বা রাস্ট (Rust), অ্যান্থ্রাক্নোজ (Anthracnose) ইত্যাদি।

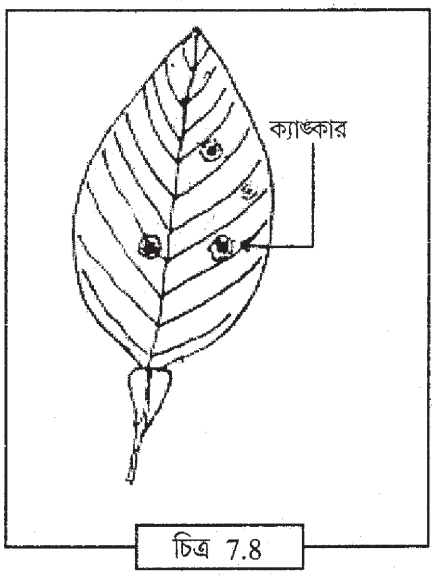

চিত্র 7.8

প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য নেক্রোসিস বা পচনযুক্ত লক্ষণ উদ্ভিদে দেখা দেয় জীবীয় রোগ উৎপাদনকারী অথবা অজীবীয় রোগ উৎপাদনকারীর প্রভাবে। জীবীয় রোগ উৎপাদনকারী বা প্যাথোজেনের প্রভাবে যখন নেক্রোসিস হয় তা প্যাথোজেন সৃষ্ট উৎসেচক। বিষাক্ত পদার্থ ইত্যাদির কারণে হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত পদার্থ উক্ত কোষকে বিনষ্ট করে। অজীবীয় রোগ উৎপাদনকারী দ্বারা সংঘটিত নেক্রোসিস জল বিভিন্ন খনিজ লবণের ঘাটতি জনিত কারনে অথবা পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবকের (যেমন তাপমাত্রা, দূষণ ইত্যাদি) সরাসরি ক্ষতিকারক প্রভাবে ঘটে।

7.7.2 অ্যাট্রফিক (Atrophic) বা হাইপোপ্ল্যাসটিক (Hypoplastic) লক্ষণ ঃ

উদ্ভিদ-রোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় উদ্ভিদ অঙ্গোর বা সমগ্র উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং এর কারণ অ্যাট্রফি (Atrophy) অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষের আয়তনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া এবং আনুসঙ্গিক বিভিন্ন উপাদানের ঘাটতি হওয়া। অথবা হাইপোপ্ল্যাসিয়া (Hypoplasia) অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষের কোষ-বিভাজনের হার কমে যাওয়া। অ্যাট্রফিস বা হাইপোপ্ল্যাসটিক কিছু লক্ষণ নীচে উল্লেখ করা হল।

7.7.2.1 খর্বতা বা ডোয়ার্ফিং (Dwarfing) ঃ

এক্ষেত্রে সমগ্র উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদ অঙ্গোর স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃদ্ধি ও পরিস্ফুটন ঘটে। ফলে ঐ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ অঙ্গা খর্বতা প্রাপ্ত হয়।

7.7.2.2. গোলাকার ধারণ বা রোসেটিং (Rosetting) ঃ

এটিও খর্বতা বা ডোয়ার্ফিং-এর একটি রূপ। এক্ষেত্রে উদ্ভিদের কাণ্ড বা শাখার পর্বমধ্যগুলির দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবে হয় না ফলে পাতাগুলি ঘনসন্নিবেশিত হয়ে অনেকটা গোলাপের আকার ধারণ করে।

7.7.2.3 ক্লোরোসিস (Chlorosis) বা পাণ্ডুরোগ ঃ

এক্ষেত্রে সবুজ কলায় ক্লোরোফিল কণিকা উৎপাদন ব্যাহত হওয়া অথবা বিনষ্ট হওয়ার কারণে উক্ত কলা হলুদ বণঃ ধারণ করে। উদাহরণ—পীচ গাছের পাতার হলুদ বর্ণ ধারণ যা পাইটোপ্লাজমা (মলিকিউট) দ্বারা সংঘটিত হয়। অনেক সময় ক্লোরোসিস প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট ধরণ বজায় রেখে হয় যার ফলে দেখা যায় ঘন সবুজ পাতায় হালকা সবুজ অথবা হলুদ ছোপ ছোপ গঠন। এরূপ গঠন দেখা গেলে তাকে মোজাইক (Mosaic) রোগ বলে। উদাহরণ—ভাইরাস ঘটিত টোব্যাকো মোজাইক রোগ (Tobaco mosaic disease) (চিত্র 7.9)।

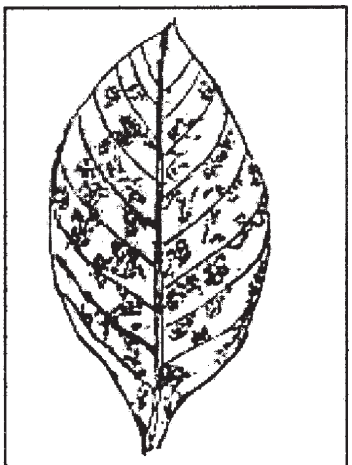

চিত্র 7.9

7.7.2.4 ভেন্ ক্লিয়ারিং (Vein clearing) বা শিরা-নিকাশ ঃ

এটিও একপ্রকার ক্লোরোসিস রোগ, তবে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র পাতার শিরায় ক্লোরোফিলে ঘটনাটি ঘটে এবং সাধারণতঃ ভাইরাস সংক্রমনে এটি ঘটে।

7.7.3 হাইপারট্রফিক (Hypertrophic) অথবা হাইপারপ্ল্যাসটিক (Hyperplastic) লক্ষণ ঃ

উদ্ভিদ রোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোষের আয়তনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি (Hypertrophy), অথবা দ্রুত কোষ বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হাইপারপ্ল্যাসিয়ার (Hyperplasia) কারণে, অথবা হাইপারট্রফি ও হাইপারপ্ল্যাসিয়ার সমবেত প্রভাবে উদ্ভিদ অঙ্গের বা সমগ্র উদ্ভিদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যায়, এবং একেই হাইপারট্রফিক বা হাইপারপ্ল্যাসটিক লক্ষণ বলে। নীচে এই ধরনের কয়েকপ্রকার লক্ষণ উল্লেখ করা হল।

7.7.3.1 গল (Gall) ঃ

উদ্ভিদ অঙ্গের অধিক বৃদ্ধির ফলে ফুলে ওঠা বিকৃত গঠনকে গল বলে। এটি সাধারণত প্যাথোজেনের সংক্রমণের ফলে সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্রাকার গলকে ওয়ার্ট (Wart) রোগ, যা সিন্কিট্রিয়াম্ অ্যাণ্ডোবায়োটিকাম্ (*Synchytrium endobioticum*) নামক ছত্রাকের সংক্রমণে ঘটে ; অ্যাগ্রোব্যাক্টেরিয়াম্ (*Agrobacterium*)

ঘটিত ক্রাউন গল (Crown gall) রোগ, যা গোলাপ, পীচ ইত্যাদি উদ্ভিদে দেখা যায় (চিত্র 7.10)।

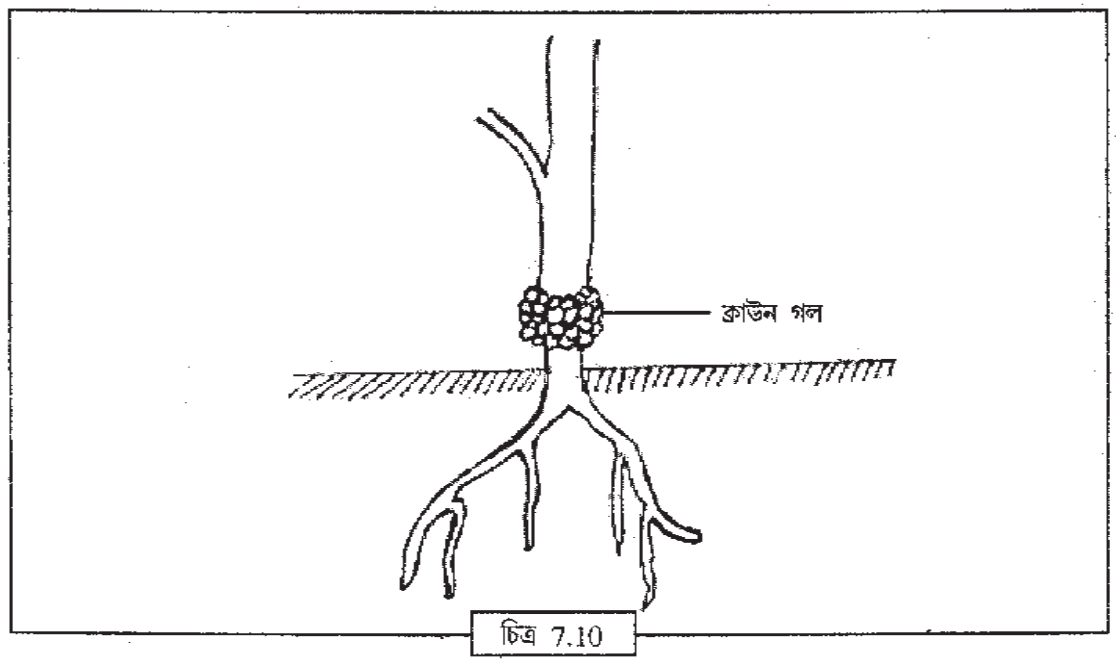

চিত্র 7.10

7.7.3.2 উইচেস্ ব্রুম (Witches broom) (চিত্র 7.11) ঃ

উদ্ভিদের এই রোগে স্ফীত কাণ্ড হতে অসংখ্য সরু ও সমান্তরাল শাখা উৎপন্ন হয় ও ঝাঁটার আকার প্রদান করে। উদাহরণ—ট্যাফ্রিনা **(Taphrina)** নামক ছত্রাক কর্তৃক চেরীগাছে এই রোগ সৃষ্টি হয়।

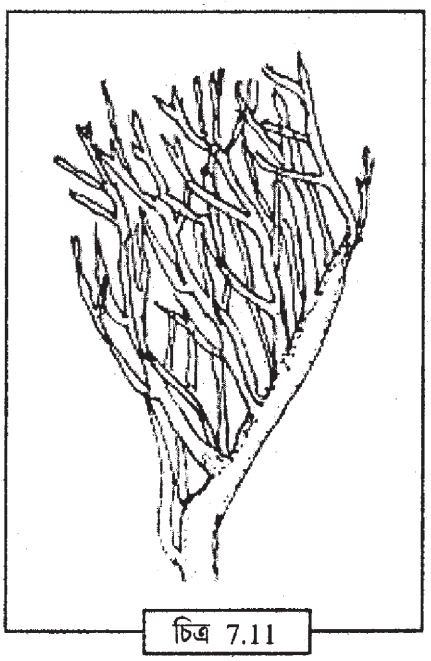

চিত্র 7.11

7.7.3.3. কার্ল (Curl) বা কুঞ্চিত রোগ (চিত্র 7.12) ঃ

এক্ষেত্রে প্যাথোজেন কর্তৃক আক্রান্ত পাতা বা কাণ্ডের কতিপয় অংশের কোষগুলির দ্রুত বৃদ্ধি ও কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভিদের ঐ সমস্ত অঙ্গ বেঁকে যায় বা কুঞ্চন প্রদর্শন করে। উদাহরণ—ট্যাফ্রিনা (Taphrina) নামক

ছত্রাক কর্তৃক সৃষ্ট পীচ পাতার কুঞ্চন বা পীচ লিফ্ কার্ল (Peach Leaf curl) রোগ।

চিত্র 7.12

7.7.3.4 ক্লাব রুট (Club root) (চিত্র 7.13) ঃ

এই রোগটি সাধারণত ব্র্যাসিকেসী (Brassicaceae) গোত্রের উদ্ভিদ-মূলে দেখা যায়। এটি একপ্রকার গল জাতীয় রোগ। এক্ষেত্রে সংক্রামিত মূলের কোষের আয়তনের দ্রুত বৃদ্ধি ও বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মূলের স্ফীত ঘটে। উদাহরণ—প্লাজমোডিওফোরা (Plasmodiophora) নামক মিক্সোমাইসিটিস (Myxomycetes) শ্রেণিভুক্ত সদস্য কর্তৃক সংক্রামিত বাঁধাকপির মূলে এই রোগ দেখা যায়।

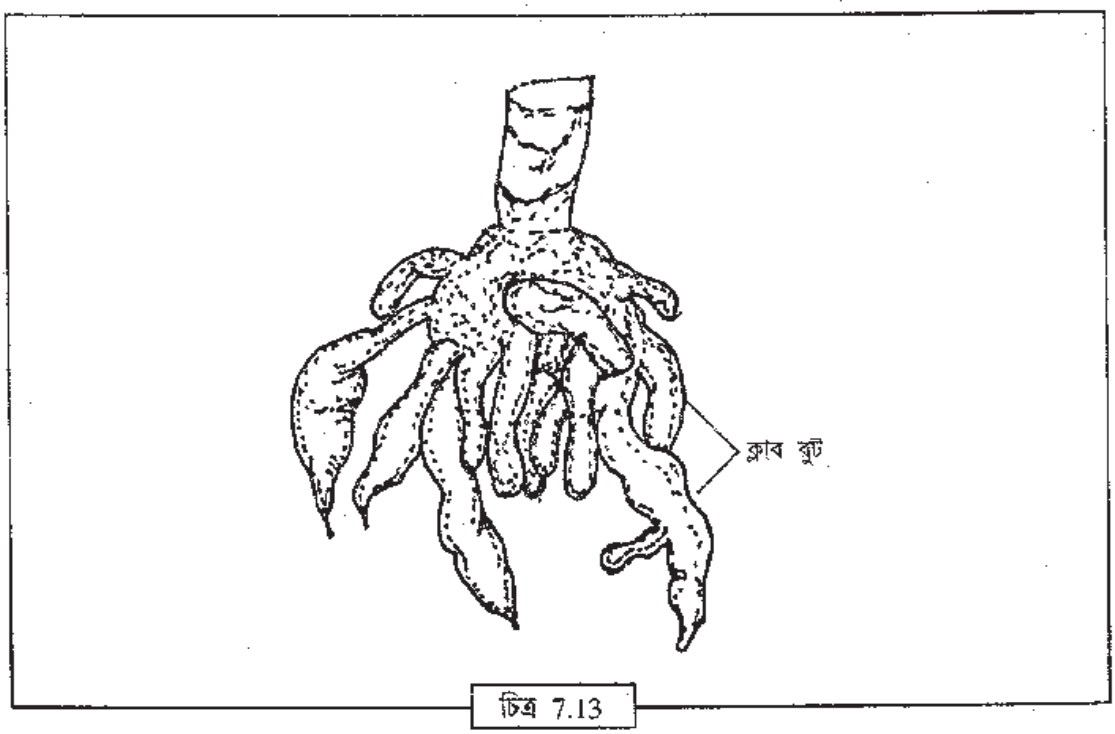

চিত্র 7.13

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংক্রমণ জনিত উদ্ভিদ কোষের আয়তন বৃদ্ধি বা বিভাজনের মাধ্যমে কোষের সংখ্যার বৃদ্ধি সাধারণতঃ প্যাথোজেন কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক, যেমন ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Indole acetic acid, IAA), সাইটোকাইনিন (Cytokinin) ইত্যাদির প্রভাবে ঘটে।

7.8 উদ্ভিদের রোগ দমন

পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে উদ্ভিদ-রোগের কারণে শুধুমাত্র এশিয়া মহাদেশে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 47.1% এবং ডলারের অঙ্কে প্রায় 145 বিলিয়ন ডলার। কাজেই সমগ্র পৃথিবীর ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ক্ষতি কতখানি ভয়াবহ তা সহজেই অনুমেয়। যদিও উন্নত দেশগুলির যথাযথ উদ্ভিদ-রোগ দমন পদ্ধতি আরোপ করে এই ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশেই কমাতে পেরেছে, কিন্তু উন্নতিশীল দেশগুলিতে ক্ষতির পরিমাণ আজও উদ্বেগ জনক। এখন আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে উদ্ভিদ-রোগ বিদ্যার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ-রোগ দমন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্ভিদ-রোগ দমনের নানা পদ্ধতি রয়েছে এবং এগুলি হল—

(i) রেগুলেটরি (Regulatory) বা নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি,

(ii) কালচার‍্যাল (Cultural) বা কর্ষণমূলক পদ্ধতি,

(iii) ফিজিক্যাল (Physical) বা ভৌত পদ্ধতি,

(iv) কেমিক্যাল (Chemical) বা রাসায়নিক পদ্ধতি, এবং

(v) বায়োলজিক্যাল (Biological) বা জীবিয় পদ্ধতি।

7.8.1 নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি বা রেগুলেটরি মেথড (Regulatory method) ঃ

নিয়ন্ত্রক পদ্ধতির ক্ষেত্রে উদ্ভিদের সঙ্গারোধ ব্যবস্থা বা কোয়ার‍্যানটাইন মেসার (Quarantine measure) আরোপ করে একদেশ থেকে অন্য দেশে অথবা একই দেশের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, গমের কারন্যাল বান্ট (Karnal bunt of wheat) রোগ ভারতে, ধানের খর্বতা (Rice dwarfing) রোগ জাপানে, আলুর আঁচিলে রোগ বা ওয়ার্ট ডিজিজ (Wart disease of potato) দার্জিলিং জেলার পাহাড়-অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

7.8.2 কর্ষণমূলক পদ্ধতি বা কালচার‍্যাল মেসার (Cultural measure) ঃ

এক্ষেত্রে কোন ভৌত বা রাসায়নিক ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ-রোগ দমন করতে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয় তা হল—(i) রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ অংশের নির্মূলন বা ইর‍্যাডিকেশন (Eradication), (ii) স্বাস্থকর অবস্থা বা স্যানিটেশন (Sanitation) বজায় রাখা, (iii) শস্য পর্যায় বা ক্রপ রোটেশন (Crop rotation) ঘটানো, (iv) উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক ব্যবস্থাগুলির (প্রয়োজনীয় জল, সার ইত্যাদি প্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি) উন্নতি সাধন, (v) প্যাথোজেনের জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা ও (vi) কলা কর্ষণ বা টিসু কালচারের (Tissue culture) প্রয়োগ। এক্ষেত্রে অসংক্রামিত ভাজক কলা ব্যবহৃত হয়।

7.8.3 ভৌত পদ্ধতি বা ফিজিক্যাল মেসার (Physical measure) ঃ

এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (i) অপেক্ষাকৃত উচ্চতাপমাত্রা (মাটি ও রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ অঙ্গ হতে প্যাথোজেন দূরীকরণের জন্য) অথবা নিম্ন তাপমাত্রা (রসালো ও নরম উদ্ভিদ অঙ্গের রোগ দমনে), (ii) বিভিন্ন বিকিরণ, যেমন এক্স রশ্মি (X-rays), গামা রশ্মি (γ-rays) ও অতি বেগুনী রশ্মি বা আলট্রাভায়োলেট রশ্মি (Ultraviolet rays).

7.8.4 রাসায়নিক পদ্ধতি বা কেমিক্যাল মেসার (Chemical measure) ঃ

এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক পদাথ: ব্যবহার করে উদ্ভিদ-রোগ দমন করা হয়, রাসায়নিক পদাথ:গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এবং এগুলি হল—(i) অজৈব যৌগ, (ii) জৈব যৌগ এবং (iii) অ্যান্টিবায়োটিক।

7.8.4.1 অজৈব যৌগ বা ইনঅর‍্যানিক কম্পাউন্ড (Inorganic compound) ঃ

উদ্ভিদ-রোগ দমনের জন্য যে অজৈব যৌগগুলি ব্যবহৃত হয় তা হল তামা বা কপার (Cu) ঘটিত, পারদ বা মারকারি (Hg) ঘটিত, গন্ধক বা সালফার (S) ঘটিত, বেরিয়াম ঘটিত ইত্যাদি যৌগ। ছত্রাক ঘটিত উদ্ভিদ-রোগ দমনে সাধারণভাবে ব্যবহৃত পদার্থগুলি হল বোঁর্দো মিশ্রণ বা বোঁদো মিক্সচার (Bordeaux mixture), বারগ্যান্ডি মিক্সচার (Burgandy mixture), মারকিউরিক ক্লোরাইড ($HgCl_2$), মারকিউরাস ক্লোরাইড (Hg_2Cl_2), সালফার গুঁড়ো (S-dust) ইত্যাদি।

বোঁর্দো মিক্সচার বা মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয় তুঁতে বা কপার সালফেট (5 পাউন্ড), কলিচুন (5 পাউন্ড) এবং জল (50 গ্যালন) মিশিয়ে। এইভাবে উৎপন্ন বোঁর্দো মিশ্রণে (5 : 5 : 50) অবস্থিত তুঁতে মূলতঃ ছত্রাক ও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে এবং চুন উদ্ভিদের প্রতি তুঁতের বিষক্রিয়া কমাতে সাহায্য করে। বোঁর্দোমিশ্রণ আবিষ্কার করেন মিলারডেট (1882)। এটি সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ছত্রাকনাশক বা ফাংগিসাইড এবং আজও এটি বহুল ব্যবহৃত হয়।

বারগ্যান্ডি মিক্সচার বা মিশ্রণের ক্ষেত্রে চুনের বদলে কাপড় কাচার সোডা বা সোডিয়াম কার্বনেট (Na_2CO_3) ব্যবহার করা হয় এবং এই মিশ্রণ প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় তুঁতে : সোডা : জল-5 পাউন্ড : 6.25 পাউন্ড : 50 গ্যালন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ ছত্রাক নিধনে অংশগ্রহণ করে কিন্তু পোষকের কোন ক্ষতিসাধন করে না তাদেরকে প্রকৃত ছত্রাকনাশক বা ট্রুফাংগিসাইড (True fungicide) বলে। আবার যদি কোন রাসায়নিক পদার্থ ছত্রাকের বৃদ্ধি প্রতিহত করে কিন্তু ধ্বংস করে না, তাকে ফ্যাংগিস্ট্যাটিক (Fugistatic) পদাথঃ বলে। অনুরূপভাবে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থকে ব্যাকটেরিসাইড (Bactericide), পতঙ্গ বা ইনসেক্ট ধ্বংসকারীকে ইনসেক্টিসাইড (Insecticide), কীট বা মাইট (Mite) ধ্বংসকারীকে অ্যাকারিসাইড (Acaricide), বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ বা হার্ব (Herb) ধ্বংসকারীকে হার্বিসাইড (Herbicide) বলে।

7.8.4.2 জৈব যৌগ বা অরগ্যানিক কম্পাউন্ড (Organic compound) ঃ

বিভিন্ন প্রকার জৈব আবিষ্কৃত হয়েছে বা হচ্ছে যা উদ্ভিদ-রোগ দমনে সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে বা হবে। এই জৈব যৌগগুলির মধ্যে কোনটি ইনসেক্টোঅ্যাকারিসাইড (Insectoacaricide) অর্থাৎ পতঙ্গ ও কীটনাশক, অথবা কোনটি অ্যাকারোফাংগিসাইড (Acarofungicide) অর্থাৎ কীট ও ছত্রাক নাশক অথবা ফাংগিসাইড (Fungicide) অর্থাৎ ছত্রাকনাশক, ফাংগিসাইড আবার অতন্ত্রীয় বা নন্‌সিস্টেমিক (Nonsystemic) এবং তন্ত্রীয় বা সিস্টেমিক হতে পারে।

অতন্ত্রীয় বা ননসিস্টেমিক ফাংগিসাইড (Non systemic) কেবলমাত্র প্রয়োগস্থলেই ক্রিয়াশীল, তাই এইট সংস্পর্শ বা কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড (Contact fungicide) নামেও পরিচিত।

তন্ত্রীয় বা সিস্টেমিক ফাংগিসাইড (Systemic fungicide) প্রয়োগস্থল ও প্রয়োগ স্থল থেকে দূরে গিয়ে ক্রিয়া করে অর্থাৎ গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে এটি মূলের সংক্রমণ প্রতিহত করে আবার মূলে

প্রয়োগ করলে এটি পাতার সংক্রমণ দমন করতে সক্ষম, অর্থাৎ এটি উদ্ভিদ অঙ্গ কর্তৃক শোষিত হয় এবং স্থানান্তরিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইনসেক্টিসাইড, অ্যাকারিসাইড ইত্যাদিরও ফাংগিসাইডের ন্যায় সিস্টেমিক ও ননসিস্টেমিক ধর্ম বর্তমান।

এখন উদ্ভিদ-রোগ দমনের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগের উল্লেখ করা হল এবং তাদের ক্রিয়াশীলতার প্রকৃতি নির্দেশ করা হল ঃ

জৈব যৌগ বা অরগ্যানিক কম্পাউন্ড (Organic compound) :

(A) **জৈব ক্লোরিন যৌগ বা অরগ্যানোক্লোরিন কম্পাউন্ড** (Organocholorine compound) : হেপ্টাক্লোর (Heptachlor)—সংস্পর্শ পতঙ্গ নাশক বা কন্ট্যাক্ট ইন্‌সেক্টিসাইড (Contact insecticide), পেন্টাক্লোরোনাইট্রোবেনজিন (Pentachloro nitrobenzene, PCNB) বা ব্র্যাসিকল (Brassicol)—সংস্পর্শ ছত্রাক নাশক বা কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড (Contact fungicide).

(B) **জৈব ফসফরাস যৌগ অরগ্যানোফসফরাস কম্পাউন্ড** (Organophosphorus compound) : ব্রোমোফস (Bromophos)—কন্ট্যাক্ট ইন্‌সেক্টিসাইড (Contact insecticide), এডিফেন ফস্‌ (Edifenphos)—সিস্টেমিক ফাংগিসাইড (Systemic fungicide), ফেন্যামিফস্‌ (Fenamiphos)–সিস্টেমিক নিম্যাটিসাইড (Systemic rematicide)।

(C) **জৈব পারদ যৌগ বা অরগ্যানোমারকারি কম্পাউন্ড** (Organomercury compound) : মারকারহেক্সান (Mercurhexan)—কন্ট্যাক্ট ইনসেক্টিসাইড (Contact insecticide) ও কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড (Contact fungicide)

(D) **ডাইথায়োকারবামেট (Dithiocarbamate) বা জৈব গন্ধক যৌগ বা অরগ্যানোসালফার কম্পাউন্ড** (Organosulphur compound) : জিংক ইথিলিনবিসডাইথায়োকারবামেট (Zinc ethylenebisdi thiocarbamate, Zineb), ম্যাঙ্গানিজ ইথিলিনবিসডাইথায়োকারবামেট

(Mangenese ethylenebisdithiocarbamate, Maneb), জিংক ডাইমিথাইলডাইথায়োকারবামেট (Zinc dimethyl-dithiocarbamate, Ziram), ফেরিক ডাইমিথাইল ডাইথায়োকারবামেট (Ferric dimethyldithiocarbamate Ferbam) ইত্যাদি—এগুলি সবই কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড (Contact fungicide).

জৈব যৌগ বা অরগ্যানিক কম্পাউন্ড (Organic compound) :

(E) **ফেনল হতে প্রাপ্ত নাইট্রোযৌগ বা নাইট্রোডেরিভেটিভ অভ্ ফেনল** (Nitroderivative of phenol) : ডাইনোক্যাপ (Dinocap)—কনট্যাক্ট ফাংগিসাইড (contact fungicide)। নাইট্র্যাফেন (Nitrafen)—কন্ট্যাক্ট ইন্সেক্টিসাইড ও ফাংগিসাইড (Contact insecticide & fungicide) এবং সেইসাথে কন্ট্যাক্ট হারবিসাইডওে (Contact herbicide), ইত্যাদি।

(F) **থ্যালিমাডি গ্রুপ (Phthalimide group) :** ক্যাপট্যান (Captan)—কনট্যাক্ট ফাংগিসাইড (Contact fungicide), ফলপেট (Folpet)—কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড (contact fungicide) ইত্যাদি।

(G) **কুইনোন (Quinone) :** ডাইক্লোন (Dichlone), ক্লোর‍্যানিল (Chloranil)—কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড (Contact fungicide).

(H) **কারবামেট (Carbamate) :** কারবোফুর‍্যাল (Carbofuran) ওক্সামিল (Oxamyl) ইত্যাদি—সিস্টেমিক নিম্যাটিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড।

(I) **বেন্জিমিভ্যাজোল (Benzimidazole) :** বেনোমিল (Benomil) ব্যাভিসটিন (Bavistin) ইত্যাদি—সিস্টেমিক ফাংগিসাইড।

(J) **বিবিধ সিস্টেমিক ফাংগিসাইড ঃ** ভিটাভ্যস্ক (Vatavax), প্ল্যান্টভ্যাক্স (Plantvax), মেটাল্যক্সিল (Metalaxyl) ইত্যাদি।

বস্তুত বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক নামক যৌগের উদ্ভাবনের ইতিহাস বিবেচনা করলে দেখা যায় অজৈব ছত্রাক নাশক হল প্রথম পর্যায়ের উদ্ভাবিত যৌগ বা ফার্স্ট জেনারেশন্ কম্পাউন্ড (First generation compound)। দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্ভাবিত যৌগ বা সেকেন্ড জেনারেশন্ কম্পাউন্ড (Second generation compound)

হল ডাইথায়োকার্বামেট, কুইনোন, থ্যালিমাইড ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায়ের উদ্ভাবিত যৌগ বা থার্ডজেনারেশন্ কম্পাউন্ড (Third generation compound) হল সিস্টেমিক ফাংগিসাইড (Systemic fungicide).

উদ্ভিদে প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাসায়নিক যৌগগুলি ডাস্ট (Dust) বা চূর্ণ হিসাবে অথবা স্প্রে (Spray) বা সিঞ্চন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ডাস্ট বা চূর্ণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহক বা ক্যারিয়ার (Carrier) ব্যবহৃত হয় এবং এক্ষেত্রে ট্যাল্ক (Talc) বা ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, ক্যাওলিন (Kaolin) বা সোদক অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, ছাই বা অ্যাশ (Ash) ইত্যাদি বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

স্প্রে বা সিঞ্চন করার ক্ষেত্রে রাসায়নিক যৌগ হলে মিশিয়ে তার সাথে পৃষ্ঠটান হ্রাসকারী স্প্রেডার (Spreeder) বা বিস্তারক (যেমন সাবান, সালফোনিক অ্যাসিড, Sulphonic acid ইত্যাদি) এবং স্টিকার (Sticker) বা দৃঢ়বন্ধ কারক (যেমন গঁদের আঠা, শ্বেতসার ইত্যাদি) মিশিয়ে স্প্রে করা হয়। আপনারা এখন নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারছেন যে কোন রাসায়নিক যৌগ যখন কোন উদ্ভিদে সিঞ্চন করা হয় তখন ঐ যৌগটি পাতার উপর যাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে তার জন্যই স্প্রেডার ও পাতার সাথে যাতে দীর্ঘ সময় যাতে আটকে থাকতে পারে তার জন্য স্টিকার ব্যবহার করা হয়।

7.8.4.3 অ্যান্টিবায়োটিক (Antibiotic) :

অ্যান্টিবায়োটিক হল একপ্রকার জৈব পদার্থ যা কোন একটি আণুবীক্ষণিক জীব কর্তৃক সৃষ্টি হয় এবং অপর আণুবীক্ষণিক জীবের ক্ষেত্রে অতি স্বল্পমাত্রাতেই বিষক্রিয়া প্রদর্শন করে। ব্যাকটেরিয়া ঘটিত উদ্ভিদ রোগের ক্ষেত্রে যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি ব্যবহৃত হয় তা হল স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycin), টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline) ইত্যাদি। মলিকিউট (Mollicute) ঘটিত উদ্ভিদ-রোগের ক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিন বিশেষ ফলপ্রসু। ছত্রাক-ঘটিত উদ্ভিদ-রোগের ক্ষেত্রে ব্ল্যাস্টিসিডিন (Blasticidin), ক্যাসগামাইসিন (Kasugamycin) ও পলিঅক্সিন (Polyoxin) অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়।

7.8.5 জীবীয় দমন (Biological control) :

জীবিয় দমনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয় তা হল ঃ—(i) প্যাথোজেন বিরোধী আণুবীক্ষণিক জীবের ব্যবহার, যা প্যাথোজেন ধ্বংসকারী বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে ; (ii) প্যাথোজেন বিরোধী আণুবীক্ষণিক জীবের ব্যবহার যা প্যাথোজেনকে পোষক হিসাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ প্যাথোজেনের সাথে পরজীবী সম্পর্ক স্থাপন করে অধি-পরজীবিতা বা হাইপারপ্যারাসিটিজম্ (Hyperparasitism)

প্রদর্শন করে ; (iii) ফাঁদ উদ্ভিদের বা ট্রাপপ্ল্যান্টের (Trap plant) ব্যবহার (iv) প্যাথোজেন বিরোধী উদ্ভিদের ব্যবহার, যা প্যাথোজেন ধ্বংসকারী বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে ; (v) নির্বাচন ও প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদের ব্যবহার, (vi) পরস্পর বিরোধী সংরক্ষণ বা ক্রস্ প্রোটেক্শ্ন্ (Cross protection), (vii) তন্ত্রীয় অর্জিত প্রতিরোধ বা সিস্টেমিক অ্যাকোঅ্যারড্ রেজিস্ট্যান্স (Systemic acquired resistance, SAR)।

7.8.5.1 বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদনকারী আণুবীক্ষণিক জীবের ব্যবহার :

এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বিভিন্ন উদ্ভিদে ক্রাউন গল (Crown gall) নামক রোগ উৎপাদনকারী অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফ্যাসিয়েন্স (***Agrobacterium tumefaciens***) বিরুদ্ধে অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম রেডিওব্যাকটার (*Agrobacterium radiobacter*) এর K84 স্ট্রেনের (Strain) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার। এই স্টেন হতে উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যাগ্রোসিন 84 (Agrocin 84) দমন ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে।

এছাড়া ভার্টিসিলিয়াম লেকানি (***Verticillium lecanii***), সিউডোজাইমা (***Pseudozyma***) ইত্যাদি ছত্রাক বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদনের মাধ্যমে পাউডারী মিলডিউ (Powdery mildew) নামক রোগের জীবিয় দমন সম্পন্ন করতে সক্ষম।

7.8.5.2 অধি-পরজীবীতা বা হাইপারপ্যারাসিটিজ্ম্ (Hyperparasitism) (চিত্র) ঃ

আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন যে যখন একটি পরজীবী অপর একটি পরজীবীকে পোষক হিসাবে ব্যবহার করে তখন এই ঘটনাকে অধিপরজীবীতা বা হাইপারপ্যারাসিটিজম্ (Hyperparasitism) বলে এবং প্রথমোক্ত পরজীবীটিকে হাইপারপ্যারাসাইট (Hyperparasite) বলে। উদাহরণ—ট্রাইকোডারমা হারজিয়ানাম (***Trichoderma harzianum***) নামক ছত্রাক কর্তৃক গোড়া পচন বা ফুট রট (Foot rot) বা হাজারোগ বা ড্যাম্পিং অফ ডিজিজ (Damping of disease) উৎপাদনকারী ছত্রাক রাইজোকটোনিয়া সোল্যানির (***Rhizoctonia solani***) জীবীয় দমন, এছাড়া পিথিয়াম নান (***Phthium nunn***) নামক ছত্রাক কর্তৃক ব্লাইট রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক ফাইটোফ্থোরার (***Phytophthora***) দমন, ক্যাটেন্যারিয়া (*Catenaria*) নামক ছত্রাক কর্তৃক জিফেনেমা (***Xiphenema***) নামক নিমাটোডের দমন হল আধিপরজীবীতার অপর উদাহরণ।

7.8.5.3 ফাঁদ উদ্ভিদের ব্যবহার ঃ

এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় সোলেনাম নিগ্রাম (***Solanum nigrum***) নামক ফাঁদ উদ্ভিদের ব্যবহার। এই উদ্ভিদ হেটারেডরা রস্টোকিয়েনসিস (***Heterodera costochiensis***) নামক

নিমাটোডকে ডিম পাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ডিম ফুটে লার্ভা বেড়িয়ে এসে উদ্ভিদ কলায় প্রবেশ করে। কিন্তু ঐ লার্ভা আর পরিণত দশায় পরিবর্তিত হতে পারে না এবং মারা যায়।

7.8.5.4 বিরোধী উদ্ভিদের ব্যবহার ঃ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অ্যাসপ্যারাগাস (Asparagus) নামক উদ্ভিদ বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে বিভিন্ন প্রকার নিমাটোড ধ্বংস করে।

7.8.5.5 নির্বাচন ও প্রজনন বা সিলেকশ্ন অ্যান্ড ব্রিডিং (Selection & breeding)-এর মাধ্যমে জীবিয় দমন ঃ

উদ্ভিদের রোগ-প্রতিরোধী বা ডিজিজ রেজিস্ট্যান্স (Disease resistance) বৈশিষ্টে নির্ধারিত হয় একটি অথবা বহুসংখ্যক জীন দ্বারা। যখন একটি জীব কর্তৃক রোগ-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় সেই রোগ-প্রতিরোধকে একক জীন প্রতিরোধ বা মোনোজেনিক রেজিস্ট্যান্স (Monogenic resistance) বা মেজর জীন রেজিস্ট্যান্স (Major gene resistance) বা ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স (Vertical resistance) বা উল্লম্ব প্রতিরোধ বলে। ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্সের ফলে উদ্ভিদটি কোন নির্দিষ্ট প্যাথোজেনের একটি প্রকার বা রেসের (Race) বিরুদ্ধে যে কোন পরিবেশে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রদর্শন করে। কিন্তু ঐ প্যাথোজেনের অপর রেসগুলির ক্ষেত্রে কোন প্রতিরোধ প্রদর্শন করে না। প্রসংগত উল্লেখ্য প্যাথোজেনের একটি মাত্র মিউটেশন (Mutation) বা পরিব্যক্তি ঐ প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে উদ্ভিদটির গড়ে তোলা রোগ প্রতিরোধের প্রাচীর সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে পড়ার কারণ হয়।

উদ্ভিদের রোগ-প্রতিরোধ বহুসংখ্যক জীন দ্বারা নির্ধারিত হলে তাকে বহুজীনীয় বা পলিজেনিক (Polygenic) বা মাইনর জীন (Minor gene) বা হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্স (Horizontal resistance) বা অনুভূমিক প্রতিরোধ বলে। এক্ষেত্রে প্রতিটি জীন কিছু পরিমাণ প্রতিরোধ ধর্ম প্রদান করে এবং রোগ-প্রতিরোধ সম্পর্কিত জীনগুলি সমবেত ভাবে উদ্ভিদটির একটি সামগ্রিক রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে যা প্যাথজেনের সবরকম রেস (Race) বা প্রকারের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কার্যকরী। পরিবেশের তারতম্যে প্রতিরোধের মাত্রার তারতম্য ঘটে।

এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে পরিবেশের পরিবর্তন ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে না পারলেও হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে পারে। আবার ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স যেখানে প্যাথোজেনের একটি মাত্র রেসের ক্ষেত্রে উপযোগী হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্স একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে সকল প্রকার রেসের বিরুদ্ধে উপযোগী। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে ভার্টিক্যাল

রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে প্যাথোজেনের একটি মাত্র জীনের মিউটেশন বা পরিব্যাক্তি ঐ প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে উদ্ভিদের সমগ্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলতে পারে, কিন্তু হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভাঙতে হলে বহু সংখ্যক জীনের মিউটেশন প্রয়োজন। প্রসঙ্গাত আর একটি বিষয় আপনাদের জেনে রাখা প্রয়োজন তা হল হর‍্যাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে প্রতিরোধের মাত্রা খুব বেশি না হলেও অর্থাৎ ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্সের ন্যায় সম্পূর্ণ না হলেও এটি রোগের প্রকোপ কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

এ পর্যন্ত উদ্ভিদ-রোগ প্রতিরোধের আলোচনা থেকে আপনারা জেনে গেছেন রোগ প্রতিরোধে জীনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা এও জেনে গেছেন উদ্ভিদ-রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী জীনের সংখ্যার বিচারে প্রতিরোধ হতে পারে ভার্টিক্যাল বা উলম্ব অথবা হরাইজন্ট্যাল বা অনুভূমিক। এখন আপনাদের যে বিষয়টি জানা প্রয়োজন তা হল একটি রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ ভ্যারাইটি কিভাবে পাওয়া সম্ভব। রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ ভ্যারাইটি পাওয়া যেতে পারে—(i) অন্য এলাকা হতে রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ আমদানি করে এক্ষেত্রে যেটি দেখে নেওয়া হয় তা হল উক্ত এলাকায় উদ্ভিদটি স্বাভাবিক ভাবে রোগ প্রতিরোধী কি না), (ii) একটি রোগ প্রতিরোধী কিন্তু বাণিজ্যিক দিক থেকে কম গুরুত্ব সম্পন্ন (যেমন কম ফলনশীল) উদ্ভিদের সাথে রোগগ্রাহী কিন্তু বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন (যেমন উচ্চফলনশীল) উদ্ভিদের সংকরায়ণ ঘটিয়ে, (iii) পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (Mutation) ঘটিয়ে। মিউটেশনের ফলে যদি কোন রোগ প্রতিরোধী কিন্তু অন্য কোন কারণে গ্রহণযোগ্যতা নেই এমন কোন উদ্ভিদ পাওয়া যায়, তাহলে সেটিকে সংকরায়ণের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদে উন্নয়ন করা হয়।

সংকরায়ণের মাধ্যমে একটি রোগপ্রতিরোধী গ্রহণযোগ্য উদ্ভিদ উৎপাদনের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে আলুর উচ্চফলনশীল বিলম্বিত ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী উদ্ভিদ পাওয়ার জন্য সংকরায়ণ ঘটানো হয়েছিল সোলেনাম ডেমিসাম (***Solanum demissum***) নামক প্রকৃতিতে জন্মানো কম ফলনশীল উদ্ভিদের সাথে উচ্চফলনশীল রোগগ্রাহী কর্ষিত উদ্ভিদের। একই উপায় অবলম্বন করে রোগপ্রতিরোধী বীট, তুলা, টমাটো ইত্যাদি উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

7.8.5.6 পরস্পরবিরোধী সংরক্ষণ বা ক্রস প্রোটেক্শ্ন্ (Cross protection) ঃ

কোন উদ্ভিদে কম-ক্ষতিকারক একটি ভাইরাস-স্ট্রেন দ্বারা সংক্রমণ ঘটালে ঐ উদ্ভিদটি ঐ ভাইরাসের বেশি ক্ষতিকারক স্ট্রেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়াটিকেই পরস্পরবিরোধী সংরক্ষণ

বলে। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে লেবু, পেঁপে ইত্যাদি উদ্ভিদে যথাক্রমে ট্রিসটেজা ভাইরাস (Tristeza virus) ও রিংস্পট ভাইরাস (Ringspot virus)-এর ক্ষতিকারক সংক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভবপর হয়েছে।

7.8.5.7 তন্ত্রীয় অর্জিত প্রতিরোধ বা সিস্টেমিক অ্যাকোয়ার্ড রেজিস্ট্যান্স (Systemic acquired resisteance) বা SAR ঃ

এক্ষেত্রে কোন উদ্ভিদে একটি প্যাথোজেন দ্বারা সংক্রমণ ঘটালে পরবর্তীকালে ঐ উদ্ভিদটি ঐ প্যাথোজেন এবং সেইসাথে অপর প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রদর্শন করে, যেমন তামাক উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রথম পর্যায়ে, যখন সেটি টোব্যাকো মোজাইক ভাইরাসের (Tobaco mosaic virus, TMV) প্রতিরোধী, যদি TMV দ্বারা সংক্রমণ ঘটানো হয় তাহলে পরবর্তীকালে ঐ উদ্ভিদটি শুধুমাত্র TMV-র বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ প্রদর্শন করে না, এটি ফাইটোফথোরা নিকোটিঅ্যানী (*Phytophthora nicotianae*) নামক ছত্রাক ও সিউডোমোনাস ট্যাবাসি (*Pseudomonas tabaci*) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণও প্রতিহত করে।

অনুশীলনী—II

1. নীচে প্রদত্ত তালিকা থেকে উপযুক্ত শব্দ বা শব্দার্থ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) প্যাথোজেন _____ এর সাহায্যে পোষক তলের সাথে স্পর্শক্ষেত্র বৃদ্ধি করে ও দৃঢ়বদ্ধ হয়। এই গঠনটি হতে উৎপন্ন হয় — যা পোষকের মধ্যে প্রবেশ করে ও — ঘটায়।

(b) প্যাথোজেন কর্তৃক — সংঘটিত হওয়ার পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়কে — — বলে।

(c) রোগের লক্ষণ যদি সংক্রমণস্থানকে ঘিরেই সীমাবদ্ধ থাকে সেই রোগকে — — বলে। পক্ষান্তরে রোগের লক্ষণ যদি সংক্রমণস্থল হতে দূরে প্রকাশ পায় সেই রোগকে — — বা — — বলে।

(d) ধানের বাদামী দাগ হল — লক্ষণ, গোলাপাকার ধারণ হল — লক্ষণ, ক্লাব রুট হল— লক্ষণ।

(e) উদ্ভিদ-রোগ দমনের পদ্ধতিগুলি হল —, —, —, — ও —।

(f) বোঁর্দো মিশ্রণ একপ্রকার — ফাংগিসাইড এবং এর উপাদান —, — ও —।

(g) যে রাসায়নিক পদার্থ পতঙ্গ (ইন্‌সেক্ট) ও কীট (মাইট) ধ্বংস করে তাকে — এবং যে রাসায়নিক পদার্থ কীটও ছত্রাক ধ্বংস করে তাকে — বলে।

(h) ডাইথেন এক প্রকার — — ও ব্যাভিসটিন একপ্রকার — —।

(i) — — ফাঁদ উদ্ভিদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(j) — — ব্যাকটেরিয়ামটি — — ব্যাকটেরিয়াম দমনে ব্যবহৃত হয়।

(k) একটি জীন নিয়ন্ত্রিত উদ্ভিদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে — — বলে এবং বহু জীন নিয়ন্ত্রিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে — — বলে।

(*সোলেনাম নিগ্রাম, অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফ্যাসিয়েন্স, ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম রেডিওব্যাকটার,* হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্স, সিস্টেমিক ফাংগিসাইড, অ্যাপ্রেসোরিয়াম, ইন্‌ফিউবেশন্ পিরিয়ড, কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড, ইন্‌ফেকশন্ স্থানিক রোগ, ইন্‌ফেকশন হাইফা, তুঁতে, তন্ত্রীয় রোগ, অজৈব, কলিচুন, সিস্টেমিক ডিজিজ, জল, সংক্রমণ, বায়োলজিক্যাল, নেক্রোটিক, অ্যাকারোফাংগিসাইড, ক্যালচার‍্যাল, ইনসেক্টোঅ্যাকারিসাইড, ফিজিক্যাল, হাইপারট্রফিকস, রেগুলেটরি, অ্যাট্রফিক, কেমিক্যাল।)

7.9 সারাংশ ঃ

এই এককটি পড়ে আপনারা জেনে গেছেন ঃ

● অন্যান্য জীবের ন্যায় উদ্ভিদেও রোগ হয় এবং এই রোগের ফলে উদ্ভিদ দুর্বল হয়ে পড়ে, এমনকি মারাও যায়। তবে এরা মানুষের মত বলতে পারে না রোগের অসুবিধার কথা। তাই সুস্থ উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করে এবং লক্ষণ দেখে রোগগ্রস্থ উদ্ভিদকে চিহ্নিত করা হয়।

● উদ্ভিদ-রোগের জন্য দায়ী বায়োটিক ও অ্যাবায়োটিক কসাল এজেন্ট।

● উদ্ভিদ-রোগ সম্বন্ধে অধ্যয়ণ করতে বা জানতে হলে বেশ কিছু শব্দাবলীর সাথে পরিচিত হতে হয়, কারা এই শব্দগুলি উদ্ভিদ-রোগবিদ্যাতেই ব্যবহৃত হয়, যেমন সাসেপ্ট, প্যাথোজেন, ইনোকুলাম, ইনফেকশন্, সিম্পটম, সাইন ইত্যাদি।

● রোগের পরিস্ফুটন ঘটে মূলত তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এবং এগুলি হল ইন্‌ফেকশন্, ইন্‌কিউবেশন্ এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশ।

● কোন একটি অজানা রোগের এবং তার জন্য কোন প্যাথোজেন দায়ী, অর্থাৎ ঐ রোগ ও প্যাথোজেনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে Koch-এর স্বতঃসিদ্ধতা বা Koch-এর মৌলিক নীতি অনুসরণ করতে হয়।

● উদ্ভিদ রোগ সম্পর্কে জানতে হলে ও রোগটি প্রাথমিক ভাবে কিছুটা শনাক্ত করতে হলে রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি জানা প্রয়োজন এবং এই লক্ষণগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় এবং এগুলি হল নেক্রোটিক, অ্যাট্রফিক অথবা হাইপোপ্ল্যাসিয়া এবং হাইপারট্রফিক অথবা হাইপারপ্ল্যাসিয়া।

● উদ্ভিদ-রোগ বিদ্যায় শুধুমাত্র রোগের কারণ, রোগ উৎপাদন পদ্ধতি ও রোগের লক্ষণ নিয়েই আলোচনা করা হয় না। রোগের দমন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয় এবং এটি উদ্ভিদ-রোগ বিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

● উদ্ভিদ-রোগ দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে এবং এগুলি হল রেগুলেটরি, কালচার‍্যাল, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল। এই দমন পদ্ধতিগুলির মধ্যে সাফল্যের মাপ কাঠিতে এবং ব্যবহারে কেমিক্যাল পদ্ধতি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। তবে বর্তমানে বায়োলজিক্যাল পদ্ধতিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

● উদ্ভিদ-রোগ দমনের ক্ষেত্রে অজৈব ও জৈব উভয়প্রকার কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। ইতিহাসের বিচারে উদ্ভিদ-রোগ দমনে প্রথমের দিকে ব্যবহৃত হত অজৈব রাসায়নিক পদার্থ। পরবর্তীকালে জৈব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে এর ব্যবহারই সর্বাধিক।

● রাসায়নিক পদার্থগুলির কোনটি প্রয়োগস্থলেই কেবলমাত্র সক্রিয় (কন্ট্যাক্ট কেমিক্যাল) আবার কোনটি প্রয়োগস্থল হতে দূরে গিয়েও সক্রিয় (সিস্টেমিক কেমিক্যাল)।

● বায়োলজিক্যাল দমনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্ট উদ্ভিদ ভ্যারাইটি উৎপাদনকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য বর্তমানে একটি জীব দ্বারা অপর জীব অর্থাৎ প্যাথোজেনের দমনের নিত্য নূতন দিক উন্মোচিত হচ্ছে।

7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

(a) উদ্ভিদ-রোগ কী ?

(b) উদ্ভিদ-রোগবিদ্যা কী ?

(c) নেক্রোসিস

(d) ভাইরয়েডের সংজ্ঞা দিন।

(e) PSTV কী ?

(f) প্যাথোজেনেসিটি কী ?

(g) সংক্রমণ কী ?

(h) ইনোকুলাম কী ?

(i) লীঝ্ন্ কী ?

(j) সিন্ড্রোম কী ?

(k) রোগ চক্র কী ?

(l) ডিজিজ ট্রাইঅ্যাংগল কী ?

(m) zineb, ziram ও Ferban-এর পুরো নাম লিখুন।

2. পার্থক্য নিরূপণ করুন।

(a) সিম্পটম ও সাইন

(b) হাইপারট্রফি ও হাইপারপ্ল্যাসিয়া

(c) রট ও ড্যাম্পিং অফ ডিজিজ

(d) গল ও ওয়ার্ট

(e) ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ও হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্স

3. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন ঃ

(a) কখ্-এর স্বতঃসিদ্ধতা,

(b) রোগ চক্র,

(c) অজৈব ফাংগিসাইড

(d) হাইপারপ্যারাসিটিজম্

(e) হাইপারট্রফিক ও হাইপারপ্ল্যাসিয়া লক্ষণগুলি

4. (a) উদ্ভিদ রোগের পরিস্ফুটনের পর্যায়গুলি কী কী এবং তা ব্যাখ্যা করুন।

(b) উদ্ভিদ-রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি কী কী এবং তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

(c) উদ্ভিদ-রোগ কী কী পদ্ধতিতে দমন করা যায়? উদ্ভিদ রোগের জীবীয় দমন আলোচনা করুন।

(d) উদ্ভিদ রোগের জৈব রাসায়নিক দমন সম্পর্কে একটি ধারণা তুলে ধরুন।

7.11 উত্তরমালা ঃ

অনুশীলনী—1

(a) বায়োটিক কসাল এজেন্ট, অ্যাবায়েটিক কসাল এজেন্ট

(b) প্রোক্যারিওটিক, টেট্রাসাইক্লিন, স্পাইরোপ্লাজমা, ফ্লোয়েম

(c) নগ্ন, একতন্ত্রী RNA

(d) প্রধান, সমান্তরাল

(e) সাসেপ্ট, প্যাথোজেন, পরজীবী, প্যাথোজেন

(f) নীঝ্ন্যাল এরিয়া, এটিওলজি

(g) পোষক, প্যাথোজেন, পরিবেশ, মিথোস্ক্রিয়া, ত্রিভুজ, ত্রিভুজ।

অনুশীলনী—2

(a) অ্যাপ্রোসোরিয়াম, ইন্‌ফেকশ্‌ন্‌ হাইফা, সংক্রমণ

(b) ইন্‌ফেকশ্‌ন্‌, ইন্‌কিউবেশন্‌, পিরিয়ড

(c) স্থানিক রোগ, তন্ত্রীয় রোগ, সিস্টেমিক ডিজিজ

(d) নেক্রোটিক, অ্যাট্রফিক, হাইপারট্রফিক

(e) রেগুলেটরি, কালচার‍্যাল, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল

(f) অজৈব, তুঁতে, কলিচুন, জল

(g) ইনসেক্টোঅ্যাকারিসাইড, অ্যাকারোফাংগিসাইড

(h) কন্ট্যাক্ট ফাংগিসাইড, সিস্টেমিক ফাংগিসাইড

(i) সোলেনাম্‌ নিগ্রাম্‌,

(j) অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম রেডিওব্যাকটার, অ্যাগ্রোব্যাকটেরিয়াম টিউমিফ্যাসিয়েন্স

(k) ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স, হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্স

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

1. (a) 7.2.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(b) 7.2.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(c) নেক্রোসিস হল উদ্ভিদের পচন রোগ। সাধারণতঃ এই রোগ প্যাথোজেন দ্বারা উৎপাদিত উৎসেচক ও অধিবিষ বা টক্সিনের প্রভাবে ঘটে। উৎসেচক ও অধিবিষের প্রভাবে উদ্ভিদ কোষ বিনষ্ট হয়। উদাহরণ—পাতার দাগ রোগ, ব্লাইট, রট ইত্যাদি। প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য বায়োটিক কসাল এজেন্ট ছাড়াও অ্যাবায়োটিক কসাল এজেন্টের প্রভাবে নেক্রোসিস হতে পারে।

(d) 7.3 অনুচ্ছেদ প্রান্তলিপি দেখুন।

(e) PSTV–Potato spindle tuber viroid.

(f) 7.4.5 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(g) 7.4.8 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(h) 7.4.9 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(i) 7.4.13 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(j) 7.4.12 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(k) 7.4.15 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(l) 7.4.16 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(m) 7.8.4.2 (D) অনুচ্ছেদ দেখুন।

2. (a) 7.4.10 ও 7.4.11 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(b) হাইপারট্রফি—উদ্ভিদ-রোগের এই ক্ষেত্রে কোষের আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

হাইপারপ্ল্যাসিয়া—উদ্ভিদ-রোগের এই ক্ষেত্রে কোষের দ্রুত বিভাজনের ফলে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(c) রটা (বা পচন রোগ)—যে কোন বয়সের উদ্ভিদের কলা সংক্রমণের ফলে নরম হয়ে যায়, বর্ণের পরিবর্তন বা বর্ণহীন হয়ে যায় অথবা বিনষ্ট হয়।

ড্যাম্পিং আফ—এটিও একপ্রকার পচন রোগ তবে এটি সাধারণত চারা গাছের কাণ্ডের যে অংশ মাটির উপরিতল সংলগ্ন থাকে সেই অংশে দেখা যায়। এই রোগের ফলে চারাগাছটি নেতিয়ে পড়ে।

(d) 7.7.3.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(e)

ভার্টিক্যাল রেজিস্ট্যান্স	হরাইজন্ট্যাল রেজিস্ট্যান্স
(i) পোষকের একটি জীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	(i) পোষকে বহুজীন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
(ii) প্যাথোজেনের একটি রেসের বিরুদ্ধে উপযোগী।	(ii) সব রেসের বিরুদ্ধে উপযোগী।
(iii) প্রতি সম্পূর্ণ	(iii) প্রতিরোধ অসম্পূর্ণ।
(iv) পরিবেশের কোন প্রভাব নেই।	(iv) পরিবেশের প্রভাব আছে।
(v) প্যাথোজেনের একটি জীনের মিউটেশন সব প্রতিরোধ ভেঙে ফেলতে পারে।	(v) বহুজীনের মিউটেশন প্রয়োজন সব প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙতে।
(vi) প্রজনন প্রক্রিয়ায় জীনের স্থানন্তরকরণ সহজ	(vi) প্রজনন প্রক্রিয়ায় সবজীবের স্থানান্তকরণ কঠিন।

3. (a) 7.6 অনুচ্ছেদ দেখুন।

   (b) 7.4.15 অনুচ্ছেদ দেখুন।

   (c) 7.8.4.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

   (d) 7.8.5.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।

   (e) 7.7.3 অনুচ্ছেদ দেখুন।

4. (a) 7.5 অনুচ্ছেদ দেখুন।

   (b) 7.7 অনুচ্ছেদ দেখুন।

   (c) 7.8 ও 7.8.5 অনুচ্ছেদ দেখুন।

   (d) 7.8.4.2 অনুচ্ছেদ দেখুন।